দেশ-বিদেশের লেখাপড়া

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক-শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

—বারো আনা—

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ
শিত ও কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫, ডি. এল্. রায় স্ট্রীট্
। হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

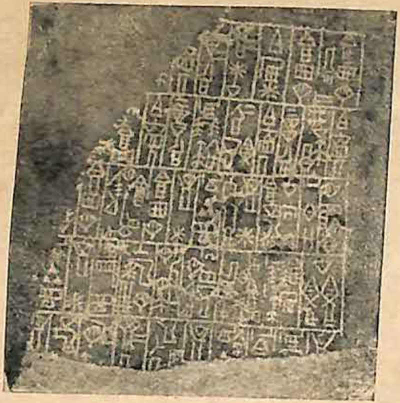
কেমন ক'রে জ্ঞানচর্চা শুরু হ'ল, লেখাপড়ার চলন হ'ল, এই বইটিতে তার গল্প লেখক বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে লিপির আবিষ্কার, ছাপাখানার জন্ম, প্রাচীনকালের গুরুগৃহে বিদ্যার চর্চা থেকে বর্তমান কালে দেশবিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কথাই এসে পড়েছে আর সেই কথাগুলি সুনিপুণ কথাশিল্পী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় মনোজ্ঞভাবে বলেছেন। এই বিষয়ে এই ধরণের বই ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি।

বইটি পড়ে ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ পাবে আর সেই সঙ্গে অনেক নূতন কথা শিখবে এইজন্যই বইখানি নিঃসঙ্কোচে তাদের হাতে সমর্পণ করা গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা পৌষ, ১৩৫০

শ্রীঅনাথনাথ বসু

সূচী





সুমেরিয়া আর মিশরের পুরোনো লেখা—
সেই গোড়ার দিকে যেমন ক'রে লিখত !

দেশ-বিদেশের লেখাপড়া

বাস্তবিক, রাগ ওর হ'তেই পারে! বেচারী মাধব সবে ঘুম থেকে উঠেছে, তখনও ভাল ক'রে চোখ মেলে চারিদিকে চাইবারই সময় হয়নি, এমন সময় দাদা নীচে থেকে হেঁকে জানিয়ে দিলেন, মাষ্টার মশাই এসেছেন। এমন চমৎকার সকাল, এমন ঝল্‌মলে রোদ—এই সময়ে কেউ পড়তে বসে? পেণ্টুলুনের পকেটে রইল লাট্টু, শার্টের পকেটে রইল গুলি, ঘুড়িগুলো যেন করুণ চোখে তার দিকে চাইতে লাগল,—কিন্তু সময় কৈ? এর ভেতরেই মা দু'বার তাড়া দিয়ে গেছেন, 'কই, পড়তে গেলি না?' হায়, হায়! মিনিট-দুই যে অন্তত লাট্টুটা ঘুরিয়ে নেবে এমন সময়ও মাধবকে কেউ দিলে না!

কাজেই, সে যখন বই খাতা নিয়ে নীচের ঘরে পড়তে এল, তখনও তার রাগ একটু কমেনি। সে জ্বালারস্‌ ক'রে দোয়াতটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখেই কোন স ফেললে, 'লেখাপড়াটা কার মাথায় প্রথম এসেছিল, তা সেক যদি দেখতে পেতুম ত তার মাথাটা ধ'রে গুঁড়িয়ে ফেুম!'

তারিণী মাষ্টার মশাই, মানে যিনি তাকে আরও ছোট বেলায় পড়াতেন এবং এখন তার ছোট ভাইবোনদের পড়ান, তাঁর কানে যদি কথাটা যেত তাহ'লে তিনি যা করতেন তা মাধবের জানাই ছিল। তিনি এ কথায় বিষম চ'টে গিয়ে ওরই মাথাটা ধ'রে দেওয়ালে বারকতক ঠুকে দিতেন। কিন্তু এখন তাকে পড়ান্ ওদের ইস্কুলেরই থার্ড মাষ্টার বিমলবাবু, তিনি ওর কথাতে রাগ ত করলেনই না, বরং বই-পত্তর গুটিয়ে রেখে, কেমন ক'রে লেখাপড়ার চলন হ'ল সেই সব কথাই গল্প করতে লাগলেন। মাধবেরও শুনতে এমন ভাল লাগ্‌ল যে, সে সমস্তক্ষণ ব'সে একমনে সেই গল্প শুনে গেল, আর তার ফলে একবারও তার কথাটা মনে হ'ল না যে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাও সেই লেখাপড়াই শেখা হ'ল!

কিন্তু সে কথা এখন থাক্—বিমলবাবু ওকে যে গল্পটা শোনালেন, সেইটেই আমি এখন তোমাদের বল্‌ব। তোমরাও শুনতে শুনতে লেখাপড়ার ওপর তোমাদের যে রাগ আছে তা নিশ্চয়ই ভুলে যাবে!

বিমলবাবু বললেন—

লেখাপড়া জিনিসটা মানুষের বয়সে
মোটেই পুরোনো হয়নি, এই মোটে সেদিন ও
বললেও চলে। কিন্তু তাই ব'লে তার আ

ঠকা
ব'
তা
দি

কিছুই করতে হ'ত না এমন কথা যদি মনে ক'রে থাক ত' বিষম ঠক্‌বে, কারণ পড়াশুনো জিনিসটা বরাবরই ছিল। মানুষ যা নিজে জানে তা অপরকেও জানাতে চায়, আর তাই চায় ব'লেই মানুষ আজ এত জিনিস জান্‌তে, শিখতে পেরেছে। মানুষ নিজের জীবনে যে-সব কথা একটু একটু ক'রে জানলে তা যদি অপরকে জানিয়ে যেতে না পারত তাহ'লে ত প্রত্যেকটি লোককেই সব কথা গোড়া থেকে শিখতে হ'ত, পৃথিবীর কাজ-কর্ম্ম কিছুই এগোত না। ধুঁতরো ফলের রসে-যে মানুষ মারা যায় একথাটা যদি সব মানুষকেই নিজে নিজে ঠেকে শিখতে হ'ত (ঠেকে শেখবার পর তা আর বিশেষ কাজেও আস্‌ত না, কেননা ততক্ষণে ত ভবলীলা শেষই হয়ে যেত) কিংবা কুইনাইন খেলে জ্বর ছাড়ে একথাটা নিজে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখে তবে যদি প্রত্যেকটি লোককে রোগের চিকিৎসা করতে হ'ত তাহ'লে মানুষের অবস্থাটা কি ভীষণ দাঁড়াত ভেবে দেখ দেখি! আকাশে যে বিদ্যুৎ চম্‌কায় তার সঙ্গে আমাদের ঘরের সুইচ্ টিপে আলো জ্বালার যে অনেকখানি যোগাযোগ আছে একথাটা কোন একটা-মানুষের জীবনেই জানা সম্ভব হ'ত না, তা সে যত বেশী দিনই বাঁচুক না কেন!

যাই হোক্—ভগবানের ইচ্ছায় সে রকম বিপদে

খুশী হন্‌ না, আমরা যে ভাবে পূজো করি, তাঁদের স্তব গান করি, তাইতেই তাঁরা খুশী হন্‌ বেশী। সেই সব স্তবেরই নাম দেওয়া হ'ল মন্ত্র। আর সেই মন্ত্র যাঁরা যত বেশী জানতেন লোকে তাঁদেরই তত বেশী খাতির করত।

আমাদের দেশেও লেখাপড়া শেখার গোড়াতে ছিল ঐ সব স্তবগান আর মন্ত্র। মুনি-ঋষিরা প্রথম প্রথম জল আগুন, চাঁদ, সূর্য্যি (যাঁরা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী উপকারে আসেন, তাঁদেরই দেবতা ব'লে মনে করা হ'ত তখন)—এই সব দেবতাদের যে স্তব গান করতেন তাকেই কিছুদিন পরে নাম দেওয়া হয়েছিল বেদ, আর প্রথম যুগের বাপেরা বা মাষ্টার মশাইরা এই বেদই ছেলেমেয়েদের ভাল করে শেখাতেন। মোট চারখানি বেদ তৈরী হয়েছিল, তারই যে শেষের খানা, অথর্ব্ববেদ, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই নানা রকমের মন্ত্র।

এই ভাবেই অনেকদিন চলবার পর মানুষ বুঝতে পারলে যে, শুধু স্তব আর মন্ত্র শেখালেই চলবে না, আরও কিছু শেখানো দরকার। প্রথম প্রথম যখন মানুষ সব দিক দিয়েই অন্য জানোয়ারদের মত ছিল, তখন তারা যখন যা খুশী হ'ত তাই করত। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর তারা দেখলে যে, এই ভাবে যা খুশী তাই ক'রে

বেড়ালে শুধু যে অপরের অসুবিধা হয় তাই নয়, নিজেকেও অনেক সময় খুব বিপদে পড়তে হয়। তখন ওরই মধ্যে যাঁরা বুড়ো লোক, তাঁরা সকলে মিলে ঠিক করলেন যে, কি ভাবে মানুষকে চলতে হবে তার একটা মোটামুটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া দরকার, নইলে সকলেরই অসুবিধা।

এটা প্রায় সব দেশের লোকেরাই এক সময়ে বুঝলে, আর যে যার নিজের দেশের মত ক'রে এক একটা আইন ঠিক ক'রে ফেললে। আমাদের দেশের এম্‌নি যে সব আইন তৈরী হ'ল তাই পরে লিপিবদ্ধ হয়ে যে আইনের বই হ'ল, তার নাম মনুসংহিতা। আমাদের দেশে যেমন মুনিঋষিরাই এসব করতেন, অন্য অন্য দেশেও তেম্‌নি যাঁরা ভগবানের পূজো-টুজো নিয়ে থাকতেন তাঁদেরই ওপর এসব ভার দেওয়া হ'ল। তার মানে বোধ হয় এই যে, যাঁরা আমাদের মত শুধু খাওয়া-দাওয়া ঘুমোনো আর ঝগ্‌ড়া-করা নিয়েই দিনরাত না কাটিয়ে ভগবানের নাম বা পূজা ক'রে সময় কাটান তাঁদেরই আমরা একটু বেশী খাতির করি। আর খাতির করি বলেই তাঁদের কথাগুলো আমরা মেনে চলি।

স্তব বা মন্ত্রের মত এই সব আইনগুলোও তখন মুখে মুখে ছেলেপুলেদের শেখানো শুরু হ'ল। কিন্তু এই

সময় আর এক বিপদ দেখা দিলে। এই যে নিয়ম-কানুন সব শেখানো হবে, এগুলোর ভাষা হবে কি ?

ভয় নেই—তুমি যে এর জবাবটা দেবার জন্য ছট্‌ফট্ করছ তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বাপু হে, ব্যাপারটা অত সহজ নয় ! তুমি বলবে, কেন, যে দেশের লোক যে ভাষায় কথা বলে সেই দেশের লোক সেই ভাষাতেই বোঝাবে, তাতে কি হয়েছে ? এইত ? কিন্তু তোমার ভুল ভেঙে দিচ্ছি। আচ্ছা, ধরো আমরা ত বাঙালী, বাংলাদেশে আমাদের বাস আর বাংলাদেশের সবাই বাংলা কথাই বলে। অথচ কলকাতার ছেলে যদি চাটগাঁয়ে যায় সেখানকার একজনেরও কথা সে বুঝতে পারবে না। শুধু কি তাই ? একই শব্দ কল্‌কাতার লোক এক রকম ক'রে উচ্চারণ করবে আর কল্‌কাতা থেকে মোটে পঞ্চাশ মাইল্ দূরের লোক আর একরকম ক'রে উচ্চারণ করবে। ঢাকার লোকের সঙ্গে নোয়াখালির লোকের কথা মিলবে না। কলকাতায় বলে মুড়ী, পূর্ব্ববঙ্গে বলে হুরুম ! কি বিপদ বলো দেখি।

এখন অবশ্য আর সে জন্য কোন অসুবিধা হয় আমরা সবাই মিলে ঠিক ক'রে নিয়েছি যে, মুখে যাই বলি না কেন, বই লেখবার সময় সকলে এক ক'রে বানান করব, একরকম ভাষাতেই লিখব।

তখন ত আর লেখার উপায় ছিল না, মুখে মুখেই সবটা বলতে হ'ত। কাজে কাজেই, অনেক ভেবে সকলে ঠিক করলেন যে, যার যেমন ক'রে খুশী কথা বলুক, এই সব বই যখন শেখানো হবে তখন একটা-ভাষাই চল্‌বে। অবশ্য দুনিয়ার সব জায়গাতেই ত একটা ভাষা চল্‌ত না, এক-একটা দল মানুষ যে জায়গাতে বাস করত সেইখানকার জন্য এক-একটা ভাষা তৈরী ক'রে নিয়েছিল। ভারতের লোকেরা তখন যে ভাষায় কথা কইত তাকে বলা হয় সংস্কৃত। কিন্তু এখন অন্য ভাষার অবস্থা যা দেখছি ভারতের সব লোকেরা তখন একইরকম সংস্কৃত ভাষায় নিশ্চয় কথা বল্‌ত না।

যাই হোক্‌—পড়াশুনো করার ভাষাকে বরাবর একরকম রাখবার জন্যও একটা নিয়ম বেঁধে দিতে হ'ল, সেই নিয়মগুলোই হচ্ছে ব্যাকরণ। কিন্তু শুধু ত নিয়ম বেঁধে দিলেই চল্‌বে না, সেটা আবার সকলের জানাও ত চাই? কাজে কাজেই, তখন থেকে ব্যাকরণও বলো শুরু হ'ল। তার মানে, মুখস্থ করার জিনিস এখ বাড়ল, সেটা বুঝলে কি?

এইভাবেই অনেকদিন যাবার পর পণ্ডিতরা বুঝলেন মানুষ শুধু কতকগুলো উপদেশ আর নিয়ম সহজে স্থ করতে চায় না, আর করলেও মনে ক'রে রাখা খুব

কঠিন। তখন তাঁরা ভাবলেন যে, গল্পর মধ্য দিয়ে বা কবিতা ক'রে বললে মুখস্থ করাও যেমন সহজ হবে, পড়বার বা মুখস্থ করবার ইচ্ছাটাও বাড়বে। তা ছাড়া, উপদেশ যা দেবার, সেগুলো গল্পের মধ্যে দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে মানুষের প্রাণেও লাগবে খুব। বিশেষ ক'রে সে গল্পগুলো যদি আবার জন্তু-জানোয়ারের গল্প হয় এবং সেগুলোকে কবিতায় বলা যায় তাহ'লে তা মনে রা আরও অনেক সহজ হবে।

এই ভেবেই আমাদের দেশের ঋষিরা রামায়ণ-মহ ভারত লিখলেন, পুরাণ লিখলেন, এমন কি ব্যাকরণে নিয়মও শ্লোক বা ছড়ায় বেঁধে দিলেন। অন্য অন্য দেশে বড় বড় মহাকাব্য লেখা শুরু হয় মানুষের দরকার বুঝেই। আমাদের দেশেও—এক রাজার গুটিকতক বোকারাম ছেলেকে কিছুতেই লেখাপড়া শেখানো যাচ্ছিল না। শেষকালে এক ব্রাহ্মণ অনেক মাথা ঘামিয়ে তাদের ডেকে শুধু কতকগুলো মজার গল্প শুনিয়ে দিলেন। তখন দেখা গেল যে, এতদিন ধরে যে সব কথা তাদে রও বোঝানো যাচ্ছিল না, সেই সব কথাই কেম অনুষ ঠিক ঠিক বুঝে গেছে। সেই গল্পগুলো পঞ্চ ব'লে তারা আজও আমাদের দেশে চলে, তোমাকেও তা বার পড়তে হবে। গ্রীসেও অনেকদিন আগে ঈশপ্ ব'লে থে ক'রে

লোক এমনি ক'রে ছোট ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের অনেক ভাল কথা শিখিয়েছিলেন। সে গল্পগুলো এমনই মিষ্টি যে, একবার শুনলে তা আর ভোলা যায় না। কাজেই তার সঙ্গে তার উপদেশগুলোও মনে থাকে। এম্‌নি ক'রেই ধীরে ধীরে সব দেশেই সাহিত্য আর কাব্য একসঙ্গে গ'ড়ে উঠেছিল।

দুই

কিন্তু এতে ক'রেই বিপদ আরও বাড়ল। আগেই তোমাকে বলেছি যে, সকলকার মাথা সমান সাফ নয়, আমার যত কথা মনে থাকে, হয়ত তোমার তা থাকে না, আবার তোমার ভায়ের হয়ত তার চেয়েও কম থাকে। সেই জন্যেই পড়ার জিনিস যত বাড়তে লাগল মানুষের ভুলের জন্যে গোলমালও তত বেড়ে চল্‌ল। ধরো এখনই যদি তোমাকে ধ'রে মহাভারত বইটি আগাগোড়া শুনিয়ে দিয়ে বলা যায় যে, তুমি গল্পটা আমাকে বলো, তাহ'লে তুমি কি মুশ্‌কিলেই না পড়বে! এখন শুনে এখনই যদি বলতে যাও তাহ'লেও অত কথা গুছিয়ে কিছুতে বলতে পারবে না। অর্দ্ধেক মনে পড়বে অর্দ্ধেক পড়বে না, যা-ও বা মনে পড়বে তাও ঠিক ঠিক বলতে পারবে না, অনেক গোলমাল ক'রে ফেলবে।

তবু তখনকার দিনের ছেলেমেয়েদের ধন্যবাদ দাও যে, তারা অনেকেই বহুদিন, বহু শত বৎসর ধ'রে রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের মত বই এম্‌নি মনে ক'রে ক'রেই শুনিয়ে এসেছে। অতখানি জিনিস ঠাকুর্দ্দা থেকে বাপ, বাপ থেকে ছেলের মুখে মুখে চলে এসেছে, কোথাও লেখা ছিল না। অনেকদিন ধ'রেই চলেছিল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে সকলের সবটা মনে থাকে না, অথচ বোকা ব'নে যাবার ভয়ে সেকথা মানে না, যেখানটা ভুলে যায় সেখানটায় যা মনে আসে তাই বানিয়ে ব'লে দেয়। আর তার ফল দাঁড়ায় এই যে, প্রথম বইটা যা তৈরী হয়েছিল তা আর সবটা পাওয়া যায় না, ভুলো অথচ ওপর-চালাক লোকদের উৎপাতে তা অনেকখানিই যায় বদ্‌লে। তখন সকলে স্থির করলেন যে, এগুলো ঠিক ক'রে লিখে রাখা যাক্—যাতে এর পর এমনধারা আর না হয়।

সেই থেকেই লেখা বইয়ের চলন হ'ল। অবশ্য তার আগে যে একেবারেই কেউ লিখতে জান্‌ত না একথা হয়ত ঠিক নয়। লিখতে জানলেও বই লিখে রাখা দরকার বলে বোধ হয় মনে করত না। আর তা ছাড়া, হাতে লিখে আর ক'খানা বই নকল করতে পারত? যাদের কাছে বই থাক্‌ত তাদের কাছে এসে প'ড়ে বা শুনে বাকী লোককে মুখস্থই করতে হ'ত।

কিন্তু তার আগে লেখার কথাটা একটু বলি—

লেখবার ইচ্ছা, মানে কালীর দাগকাটার ইচ্ছাটা মানুষের মধ্যে সেই গোড়া থেকেই আছে। প্রথম যখন পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিলে, এখন থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর কিংবা হয়ত আরও বেশী আগে—যখন তাদের বাড়ী-ঘর কিছুই ছিল না, গাছতলায় নয় পাহাড়ের গুহার মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকৃত—তখন থেকেই দেখা যায় যে, তারা ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে।

এমন কি, যখন মানুষ জন্মায়নি—মানুষের মত দেখতে বনমানুষ গোছের এক শ্রেণীর জীব সবে পৃথিবীর ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে (হয়ত তারা কথা কইতেও জান্‌ত না) —তখন থেকেই ছবি আঁকবার চেষ্টা চলেছে। এখনও ইউরোপের কোন কোন গুহায় তাদের হাতের আঁকা ছবি আছে। ছবি এঁকে মনের ভাব বোঝাবারই চেষ্টা করেছিল তারা, একথা সে ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

এখন যে দেশটাকে স্পেন বলে সেইখানে 'ক্রোম্যাগ-নন্' আর 'গ্রিমাল্‌ডি' ব'লে দুটো তখনকার দিনের গুহা এখনও আছে। তার মধ্যেই তখনকার আঁকা ছবি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই ছবির মধ্যে দিয়েই লেখবার চেষ্টা চলছিল। এখন লেখা বলতে আমরা যা বুঝি তখন

ত তা কিছু ছিল না, তারা সোজাসুজি ছবিই এঁকেছিল, কিন্তু তাদের জীবনের নানা রকম ঘটনাই তারা সেই সব ছবিতে এঁকে রেখেছিল। যেমন ধরো শিকার, একটা ছবিতে কেমন ক'রে কৌশলে তারা মস্ত বড় একটা সিংহ মেরেছে তারই গল্পটা হয়ত আগাগোড়া আঁকা আছে।

এই সময়কার অনেক দিন পরে, মানে অনেক হাজার হাজার বছর পরে মানুষ যখন একটু সভ্য-ভব্য হ'ল, তখন লেখার উপায় তারা নিজেরাই একদিন মাথা ঘামিয়ে বার করলে। মিশর দেশের কথা হয়ত তুমি শুনেছ, ম্যাপের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই দেখতে পাবে; সেইখানে, আর এখন যেখানটাকে মেসোপটেমিয়া বলে (সেখানে আগে সুমেরিয়ান ব'লে একদল লোক বাস করত) সেই সুমেরিয়ায়,প্রথম লেখার চলন আমরা দেখ্‌তে পাই। ওর মধ্যে আবার সুমেরিয়ানরাই বোধ হয় প্রথম লিখতে শেখে। মানুষের মধ্যে, যতদূর জানা গেছে, ওরাই প্রথম একটু সভ্য হয়। যাই হোক্—সুমেরিয়ান্‌দের লেখা আমরা খুব বেশী দেখ্‌তে পাই না, কারণ ওরা শেলেটের মত মাটির ফলক তৈরী ক'রে তাইতে আঁচড় কেটে লিখ্‌ত আর সেগুলো রোদে শুকিয়ে তুলে রাখ্‌ত। কাজে কাজেই, হাজার হোক্ মাটি ত, কতদিন আর থাকবে! তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। মিশরের

ক্কুরা আর একটু বেশী চালাক, তারা ঘরের দেওয়ালে, কি রের দেওয়ালেই বেশীর ভাগ লেখা রেখে গেছে, ক সেইজন্যে আমাদের পড়তে একটুও অসুবিধে হয় না। ব সে কি-রকম লেখা ? তাই বলতে যাচ্ছিলুম। এখন ব মরা যা লেখো সে রকম লেখা নিশ্চয়ই নয়। তখনও কি এঁকে লেখবার কাজ সারা হ'ত। তবে সেটা আরও সোজা, মানে এক একটা জিনিসের ছবি দিয়ে এক-একটা শব্দ বোঝানো হ'ত।

সে রকম লেখা এখনও তোমরা কতকটা দেখতে পাও। মাঝে মাঝে তোমাদের মাসিকপত্রে ছবি দিয়ে চিঠি পড়তে দেয় দেখেছ ত! মানে, মনে করো হয়ত ঘণ্টাকর্ণ নাম, সে জায়গায় একটা ঘণ্টা আর একটা কান এঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা আগুন শব্দের বদলে একেবারে খানিকটা আগুনই আঁকা আছে—তেমনি আর কি! তোমাদের ঘরের দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে বসুধারা আঁকা আছে দেখেছ ত ? মানুষের বদলে তখন হয়ত ঐ রকম লম্বা একটা কালীর দাগ কেটে, আড়ে আর-দুটো কিন্তু টেনে দিয়ে মানুষ বোঝানো হ'ত।

আর হয়েছে ই ভাবেই লেখার কাজ চলতে লাগল। কিন্তু এ য়েই সব জিনিস এঁকে বোঝানো ত সহজ নয়। হয় ইং মিশরের লোকেরাই মাথা ঘামিয়ে জিনিসটাকে

আরও সোজা ক'রে আনলে। তারা ঠিক করলেন, এক একটা শব্দের বদলে এক-একটা চিহ্ন যদি ঠিক ক'র দেওয়া হয় তাহ'লেই বেশ কাজ চল্‌বে। তখন গে সেই ব্যবস্থাই চল্‌ল। কিন্তু আরও কিছুদিন চল্‌বার দেখা গেল যে, ওতেও ভয়ানক অসুবিধা হয়। শব্দ ত কম নয়, প্রত্যেকটা শব্দের বদলে এক-একটা চিহ্ন ক'রে রাখা বড় কঠিন ব্যাপার। ইংরেজীর এই ত মোটে ছাব্বিশটা অক্ষর, তা-ই তোমাদের চেনাতে আর মনে করিয়ে রাখাতে আমাদের কী কষ্টটাই না হয়, সে কথা মনে আছে ত? ছাব্বিশটা না হ'য়ে যদি ছ'শ' হ'ত তাহ'লে ত হাল ছেড়েই দিতে হ'ত একেবারে।

এখনও কোন কোন দেশে আগেকার ব্যবস্থাই বজায় আছে। যেমন, চীন দেশ। ওরা এখনও এক-একটা শব্দের বদলে এক-একটা চিহ্নই ব্যবহার করে। ওদের বর্ণমালার দিকে যদি একবার চেয়ে দেখো ত ঐ গাছ-পালার মত অসংখ্য অক্ষর দেখে মাথা ঝিম ঝিম্ করবে তোমার।

কিন্তু সকলেরই ত চীনাদের মত লাইন চড় যে, অনায়াসে অতগুলো চিহ্ন মনে এ়তে। কাজেই তখন বর্ণমালার চলন করতে সব সময়ার মানে, অক্ষর তৈরী করতে হ'ল। তখন রের

একটু যদি ভেবে দেখ ত দেখতে পাবে কাজটা এমন কিছু শক্তও নয়। আমরা যখন কথা বলি তখন শুধু কতকগুলো আওয়াজ করি—কেমন কি না? আওয়াজ বল্‌তে বোধ হয় ঠিক বুঝলে না, গলার একটা বিশেষ স্বর বললেই ঠিক বলা হবে। আমরা কথা বলি ঢের বটে কিন্তু ঐ আওয়াজ বা স্বর বেশী বলি না। ধরো—যেমন, যখন, যতন—তিন তিনটে আলাদা শব্দ, আলাদা মানে। অথচ 'য' উচ্চারণ করতে গলা দিয়ে যে স্বর বেরোয় আর 'ন' বলতে যে আওয়াজ হয়, দুটোই এই তিনটে শব্দের মধ্যে আছে। কাজেই ঐ বিশেষ বিশেষ স্বরগুলো একটা একটা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হ'ল, আর সেই সব চিহ্নই হ'ল এক একটি বর্ণ বা অক্ষর।

আলাদা আলাদা ভাষায় অক্ষরের আলাদা আলাদা চেহারা। নামও তাদের আলাদা আছে বটে (যেমন ইংরেজীর 'বি', লাটিনের 'বিটা', উর্দ্দূর 'বে', বাংলার 'ব') কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আওয়াজটা একই। আর ঐ ধ্বনির ওপর লক্ষ্য ক'রেই বর্ণমালা তৈরী করা হয়েছে।

এখন যত বর্ণমালার চলন আছে তার মধ্যে বোধ হয় ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরই সব চেয়ে কম। মোটে

২

দিয়েই বই লিখিয়ে নেওয়া হ'ত। তালপাতা বা চামড়া বা তামার পাতের ওপর লেখার কাজ চলত, তখন কাগজ তৈরী করতেও শেখেনি লোকে। কাগজ যখন তৈরী হ'ল তখনও লেখানোর অসুবিধা সমানই রইল। পণ্ডিতরা যে সব পুঁথি লিখতেন তা হয়ত ঐ এক-কপিই থাকৃত, কিংবা খুব খরচপত্তর ক'রে আরও কয়েক কপি বই কেউ নকল করিয়ে নিতেন, কিন্তু তাতেই বা সুবিধে কি? সারা পৃথিবীতে ঐ কয়েক কপিই সম্বল হয়ে থাকৃত! কাজে-কাজেই পড়ানোর কাজটা মুখে মুখেই চল্‌ত, মাষ্টার মশাইরা বড়জোর বইটা খুলে রেখে ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্রদের কিন্তু সেই একবার শুনেই মনে ক'রে রাখতে হ'ত, বড়জোর নিজেরা কিছু কিছু লিখে নিত, রাত জেগে শুক্‌নো পাতা কিংবা কাঠ জ্বেলে তারই আলোয় প্রাণপণে মুখস্থ করত (তেল পুড়িয়ে পিদিম জ্বালবার মত অবস্থা সকলের ছিল না)। এখন যেমন তোমার বাবা, একবার বললেই, ছ' আনা আট আনা পয়সা খরচ ক'রে তোমার পড়বার বই ঝপাঝপ্ এনে দিচ্ছেন (সেই ভরসায় তুমিও হরদম বই ছিঁড়ছ!) আর তুমি খুশীমত পড়ে তুলে রাখ্‌ছ, ভাবছ পরীক্ষার সময় না হয় একটু রাত জেগে বাকীটুকু পড়ে ঠিক ক'রে নেবে, তখন এত সুবিধে ছিল না কিন্তু!

শুধু কি তাই ? এখন রাজা বা সরকার বাহাদুরের কোন আদেশ জানাতে হ'লে যেমন কাগজে ছাপিয়ে কয়েক কপি বিলিয়ে দিলেই চলে—দেশের আইনটা জানাবার দরকার হ'লে মোটা মোটা আইনের বই ছাপানো হয়—তখন এ সব কাজের জন্যে পথের ধারে ধারে পাথর বা ধাতুর তৈরী থামের গায়ে খোদাই ক'রে কিংবা পাহাড়ের গায়ে এসব কথা লিখে রাখা হ'ত।

যাই হোক্—এই হাতে-লেখা পুঁথিও সেকালের লোক বড় কম লেখেনি। বহুদিন আগেকার একদল মানুষ, এখন যেখানে মধ্য-আমেরিকা, সেইখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, পৃথিবীর এই দিকটা (মানে ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা) থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়ে। তারাও নিজেদের ধরণে একরকম বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে উঠেছিল। এখন আর সে মানুষের কেউ নেই, তাদের সেই-সময়কার ঘরবাড়ী বা কিছু কিছু চিহ্ন অনেক কষ্টে মাটির ভিতর থেকে বা জঙ্গলের মধ্য থেকে খুঁজে বার করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তাদেরও লাইব্রেরী ছিল, আর সে লাইব্রেরীতে ছিল অনেক, অনেক পুঁথি !

কিছুদিন আগে চীনের এক জায়গায় একটা বড় পাহাড়ের গুহার মধ্যে একটা লাইব্রেরী এক ফরাসী

সাহেব খুঁজে বার করেছেন, তার মধ্যে হাজারেরও ঢের বেশী পুঁথি পাওয়া গেছে। বহু শত বছর আগে হাতে লিখে লিখে অতগুলো পুঁথি জমাতে তাদের কম মেহনৎ হয়নি! উত্তর পশ্চিম দিক থেকে যখন যাযাবর ডাকাতেরা হানা দিয়েছিল তখন পাছে তাদের হাতে প'ড়ে সব বই নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে কোন রাজা গুহার মুখ একেবারে পাথর দিয়ে এঁটে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। সেখানে যে কোন গুহা আছে, বাইরে থেকে তা-ও বোঝা যেত না! সেই জন্যেই এতদিন কেউ তার খোঁজ পায়নি।

এখন থেকে দু'হাজার বছরেরও বেশী দিন আগে মিশর দেশের রাজা টলেমি এমনি একটা বড় লাইব্রেরী করেন। বহু পণ্ডিতের লেখা বহু পুঁথি সেই লাইব্রেরীতে ছিল। তোমার পড়ার ইতিহাসে আলেকজান্দারের গল্প পড়েছ নিশ্চয়ই? এই টলেমি ছিলেন আলেকজান্দারেরই সেনা-পতি, আলেকজান্দার মারা গেলে তিনি মিশরের রাজা হন্।

এ-রকম লাইব্রেরী আরও অনেক জায়গায় ছিল, পৃথিবীতে রাজাও কম জন্মাননি, পুঁথিও তাঁরা লিখে গেছেন ঢের। এই সব পুঁথি আবার যাঁরা নকল করতেন, সেই লিপিকারেরা এতে ক'রে একটা

বেশ মোটা রকম আয়ের ব্যবস্থাও ক'রে নিয়েছিলেন। তখন লোকে যত্ন ক'রে হাতের লেখা শিখত। হাতের লেখা যে কত ভাল হ'তে পারে আর কত সুন্দর ক'রে বই নকল করা যেতে পারে, তা মুসলমানদের আমলের দু'একখানা আরবি ও ফারসি পুঁথি কিংবা ইউরোপের কতকগুলো হাতে-লেখা বাইবেল দেখলে বুঝতে পারবে। দু'দশ মিনিট অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হবে।

এই উপায়েই বহুদিন আমাদের লেখা-পড়া শিখতে হয়েছে; হাজার হাজার বছর ধরে—এমন কি এই সেদিন পর্য্যন্ত! স্বয়ং সম্রাট আলমগীর কোরাণ নকল ক'রে নিজের হাত-খরচের পয়সা রোজগার করতেন তা বোধ হয় ইতিহাসে প'ড়ে থাক্‌বে।

কিন্তু এতে ক'রে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হ'ত কাদের জান? দেশের জনসাধারণ বা তোমার-আমার মত গরীব-দুঃখী লোক যারা, তাদের! তোমার বাবার অবস্থা ভালই, তবুও তখনকার দিন হ'লে তিনিও তোমাকে বেশী লেখাপড়া শেখাতে পারতেন না। কারণ হাতে লেখা পুঁথির এত বেশী দাম হ'ত যে অনেকেই তা কিনে

ছেলেমেয়েদের পড়তে দিতে পারতেন না। তা ছাড়া ভাল ভাল বই যা, যা প'ড়ে সত্যিকারের জ্ঞানলাভ হবে, তা পয়সা খরচ করলেও পাওয়া শক্ত হ'ত! ধরো তুমি তখনকার দিনেরই ছেলে, বেশী ক'রে লেখাপড়া শিখতে চাও। আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য-তারাদের সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল বেশী, তুমি সেই বিষয়ের বই পড়তে চাও। খবর নিয়ে জানলে যে, পেশোয়ারের কাছে তক্ষশিলার লাইব্রেরীতে ভাস্করাচার্য্যের লেখা একটা পুঁথি আছে, আর একটা পুঁথি আছে মিশরের কোন এক ভাঙা মন্দিরে। আর হয়ত আছে ইউরোপে। তুমি বাংলাদেশের ছেলে, তুমি কেমন ক'রে যাবে সেখানে? তখনকার দিনে এখনকার মতো রেলগাড়ীও ছিল না, জাহাজও ছিল না। কাজে কাজেই, মনের সাধ মনেই চেপে, হয়ত তোমাকে চুপচাপ ব'সে থাকতে হ'ত।

তাই ব'লে কি আর তখনকার দিনের লোকেরা একেবারেই লেখাপড়া শিখত না? তা নয়। অনেকদিন আগে আমাদের দেশের ছেলেরা গুরুগৃহে লেখাপড়া শিখত; কিছুদিন সেইখানেই বাস করতে হ'ত, গুরু মুখে মুখে পাঠ দিতেন, তারা একমনে ব'সে শুনত, অন্য সময়ে তা মুখস্থ করত, ভুলে গেলে আবার গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিত। কিংবা, বড়জোর গুরুর কাছে কোন পুঁথি থাকলে

পালা ক'রে পড়ত। কিছুদিন পরে গুরু যখন বুঝতেন যে, এদের যতদূর শেখবার ক্ষমতা ততদূর এরা শিখেছে তখন তিনি তাদের বিদায় দিতেন। পড়া শেষ ক'রে এসে যে যার নিজের কাজে মন দিত। এ আমি বল্‌ছি এখন থেকে দু'তিন হাজার বছর আগেকার কথা, তখন বিলেতের দিকে লেখাপড়ার কোন পাটই ছিল না। তখন এখানকার গুরুরা হতেন প্রায়ই সাধু-সন্ন্যাসী, নিজেরা ভিক্ষে ক'রে কিংবা রাজার মাসোহারায় খেতেন ও বিদ্যাদান করতেন।

এর পর যত দিন যেতে লাগল ততই গুরুও বাড়তে থাকলেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকরা নিজেদের বাড়ীতে টোল রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। এই সব অধ্যাপকরা রাজা বা জমিদারদের কাছে মাসোহারা পেতেন কিছু কিছু—কিংবা একেবারে কিছু জমি পেতেন, তারই আয়ে তাঁদের সংসার চলত। ছাত্র যারা পড়তে আস্‌ত তাদের কাছ থেকে পয়সা-কড়ি ত নিতেনই না, বরং তাদেরই খেতে দিতেন। এই ব্যবস্থাই এদেশে বহুদিন ধ'রে চ'লে এসেছে, এমন কি এখনও কিছু কিছু আছে!

আমাদের দেশেও যেমন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল দেশের লেখাপড়ার ভার, ইউরোপে তেমন পাদরী আর মুসলমানদের মধ্যে মৌলবীদের ওপরই এই কাজের

ভার ছিল অনেকদিন। বিলেতে (এখানে বিলেত বল্‌তে আমি সব ইউরোপই বোঝাতে চাইছি) প্রায় সব গির্জ্জের সঙ্গেই লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। মুসলমানদেরও ধর্ম্মগুরুরাই শিক্ষকের কাজ করতেন। মস্‌জিদেরই সঙ্গে সঙ্গে মক্তব বা মাদ্রাসা থাকৃত।

এইভাবে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি লেখাপড়া শিখত—খুব বেশী না হ'লেও তাতেই তাদের কাজ চলে যেত। বড় বড় পণ্ডিতরা যে সব বড় বড় পুঁথি লিখতেন সে সব তারা পড়তেও পেত না, তা তাদের কোন উপকারেও আসত না। ওরই মধ্যে যাদের লেখাপড়া শেখবার শখ খুব বেশী, তারা খুব কষ্ট ক'রে প্রাণ হাতে ক'রে এদেশে-ওদেশে ঘুরে বেড়াত। নাম-করা অধ্যাপকের কাছে পড়বার জন্যে তাঁর কাছে পৌঁছতেই হয়ত বছরখানেক সময় কেটে যেত—কিংবা আরও বেশী। সেদিন তোমার কাছে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা গল্প কর্‌ছিলুম, ভুলে যাওনি ত? বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথিগুলো প'ড়ে দেখবার জন্যে কী কষ্ট ক'রেই না তাঁকে তিব্বতে যেতে হয়েছিল।

এই যে লেখাপড়া শেখার কষ্ট, এটা হঠাৎ একদিন কী ক'রে চলে গেল জান?—ছাপাখানার সৃষ্টি হওয়াতে। বই ছাপার চলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাল ভাল বই পাওয়ার আর অসুবিধা রইল না। যে জিনিস ছিল গরীব-

দুঃখীর কাছে আকাশের চাঁদের মতই নাগালের বাইরে, সেই জিনিসই একেবারে চাল-ডাল-নুন-তেলের মত বাজারে বিক্রী হতে লাগল। মা সরস্বতী গরীবের কুঁড়েতেও পায়ের ধূলো দিলেন!

ছাপাখানার কথাটা নাকি চীনে-ভাইদের মাথাতেই প্রথমে গিয়েছিল। তুমি সেদিনই চীনেবাজার থেকে জুতো কিনে ফিরে এসে চীনেদের খুব ঠাট্টা করছিলে, না? চীনেরা কিন্তু খুব সহজ লোক নয়। ওদের মত সাফ মাথা খুব কম লোকেরই আছে। অনেক জিনিস চীনেদের মাথাতেই প্রথম ঢোকে। কাগজ, বারুদ, ছাপাখানা— আরও অনেক কিছু। চীনেরা দেখলে যে, সব বইটা গোড়া থেকে শেষ অবধি বারবার নকল না ক'রে বইটা যদি কোন কৌশলে আপনিই নকল করানো যায় ত বড় ভাল হয়। তারা মাথা ঘামিয়ে এই সহজ কথাটা বার ক'রে ফেললে যে, একটা কাঠের ওপর বা মাটির পাতের ওপর উল্টো ক'রে লেখাগুলো খোদাই ক'রে, তাই থেকে যদি কাগজের ওপর ছাপা নেওয়া যায় তাহ'লেই কি লেখা-গুলোর সোজা সোজা ছাপ উঠবে না? যেমন ভাবা অম্নি কাজে লেগে যাওয়া! বইয়ের খানিকটা খানিকটা ক'রে আলাদা ক'রে নিয়ে—ধরো এক এক পাতার মতো ভাগ ক'রে নিয়ে—এক-এক টুক্‌রো কাঠে বা

মাটির পাতে লেখা হ'ত, তাই থেকে ছাপ তুলে তুলে বই ছাপা হ'ত। এই ভাবে বই ছাপাকে বল্‌ত জিলোগ্রাফি। কাগজও চীন দেশেই আগে তৈরী হয়। চীন থেকে এই বিদ্যা অষ্টম শতাব্দীতে আরবে আসে, সেখান থেকে অনেকদিন পরে যায় স্পেনে, মূরদের মারফৎ। তারপর ইটালী ও জার্ম্মানীর চেষ্টায় একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে ভাল কাগজের চলন হয় ওদেশে।

এই নতুন ব্যবস্থাতে বই নকল করার উপায়টা সহজ হয়ে গেল বটে কিন্তু খুব সহজ হ'ল না। তার কারণ প্রত্যেকটি বইয়ের প্রত্যেকটি পাতাই আলাদা ক'রে খোদাই করতে হ'ত, তাতেও দেরী লাগত কম নয়। কিন্তু তবু আগেকার তুলনায় ঢের কম সময় লাগতে লাগল আর খাটুনিও গেল অনেক কমে। ক্রমে ক্রমে এরা আরও উন্নতি করলে। বই ছাপবার এই কৌশলটা ক্রমশ চীন থেকে কোরিয়া, কোরিয়া থেকে জাপানে ছড়িয়ে পড়ল। তার পর এল ইউরোপে—আর ইউরোপ থেকেই আরও নতুন, আরও সহজ উপায় বেরিয়ে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

সেই গল্পই এবার বল্‌ব।

চার

কেউ বলেন ইউরোপে প্রথম বই ছাপেন জার্ম্মানীর মেন্‌জ্ শহরের গুটেনবার্গ ব'লে এক ভদ্রলোক, আবার কেউ বলেন যে হল্যাণ্ডের হার্লেম শহরের লরেন্‌স্ জান্থ্ঁ কোষ্টারই প্রথম ছাপার হরপে বই বার করেন। এ ঝগড়ার আজও কোন মীমাংসা হয়নি। কাজেই ঠিক ক'রে তোমাকে কিছু বলতে পারলুম না। তবে এখন থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে, ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে গুটেনবার্গ পোপের আদেশে তাঁর একটা ইস্তাহার প্রথম ছেপে দেন। যতদূর জানা যায়, ইউরোপে প্রথম ছাপা হ'ল ঐটাই, তার আগে আর কেউ কোন লেখা বা কোন বই ছেপে থাকলেও, সে কথা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যদিও বিদ্যা-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ প্রাচ্যেই অনেক আগে হয়েছিল, তবু ভারতবর্ষে ছাপার প্রচলন হয় অনেক পরে—সিপাহী-বিদ্রোহের মাত্র একশ' বছর আগে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

গুটেনবার্গের আগে থাকতেই আলাদা আলাদা অক্ষর থেকে ছাপবার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু গুটেনবার্গ ই প্রথম সে চেষ্টা সফল করেন। একটা পাতলা কাঠে বা মাটিতে খোদাই ক'রে তা থেকে ছাপার অসুবিধা ছিল ঢের, তা তোমাদের আগেই বলেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়

অসুবিধে হ'ল এই যে, সেটা থেকে সেই বইটির সেই বিশেষ পাতাটি ছাড়া আর কিছু ছাপা যায় না। কিন্তু আলাদা আলাদা অক্ষর পাশাপাশি সাজিয়ে যদি শব্দ তৈরী করা যায় আর সেইভাবে অক্ষরগুলো বেঁধে নিয়ে বই ছাপা হয়, তাহ'লে আবার সেই অক্ষরগুলোই পরে অন্য বই ছাপার কাজেও লাগানো যায় না কি ?

গুটেনবার্গের মাথাতে এই সহজ কথাটা প্রথম এল। তিনি অক্ষর তৈরী করবার উপায়ও ঠিক ক'রে ফেললেন কিন্তু কাজে নাম্‌তে গিয়ে আসল জায়গাতে গোল বাধল। বেচারার পয়সা-কড়ি বিশেষ ছিল না, ছিল শুধু মাথাই! যাই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত উপায় একটা হ'ল। অনেক কষ্টে জন ফাস্‌ট্ আর পিটার শোফার ব'লে দু'টি পয়সাওলা লোককে জপিয়ে ১৪৫৬ সালে তিনি এই ব্যবসায় নেমে পড়লেন। প্রথম তাঁরা ছাপলেন একখানা বাইবেল, তার প্রত্যেকটি পাতায় বিয়াল্লিশ লাইন ক'রে ছাপা ছিল ব'লে তাকে বলা হয় বিয়াল্লিশ-লাইন-বাইবেল। লেখাটা ছেপে নিয়ে আবার পাতায় পাতায় হাতে ক'রে ক'রে বাহারে' ছবি এঁকে ভাল ক'রে বাঁধিয়ে বইটি তাঁরা বাজারে ছেড়ে দিলেন।

একটা কথা একটু আগে ভুল করে বলে ফেলেছি। গুটেনবার্গের মাথা ছিল বলেছি বটে কিন্তু সে মাথায়

শুধু টাইপ তৈরী করার কথা ছাড়া আর কিছুই ঢুকত না। তিনি ব্যবসায়ে নামবার আগে ফাস্ট্ বা শোফারের সঙ্গে কোন লেখাপড়াই ক'রে নেন্নি, ভেবেছিলেন এমনিই চল্বে। কিন্তু ব্যবসায়ে যখন মোটা লাভ হ'তে লাগল, আর কাজটাও ভাল ক'রে দু'জনে বুঝতে পারলে, তখনই তাদের মনে হ'ল যে, এ লোকটাকে মিছি-মিছি আর পয়সা দিয়ে লাভ কি? একদিন তারা গুটেন্-বার্গকে ডেকে শুনিয়ে দিলে যে, তাঁকে ওদের আর কোন দরকার নেই, মাইনেও আর তারা মাসে মাসে ওঁকে দিতে পারবে না!

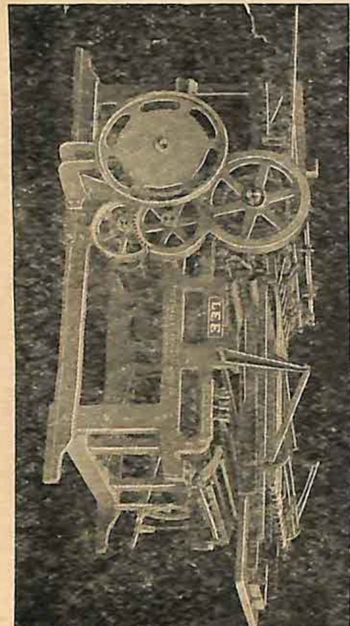
বেচারী গুটেনবার্গ! ও কারবারে যাঁর সব চেয়ে বেশী দাম ছিল তিনিই খালি হাতে শুক্নো মুখে বেরিয়ে গেলেন, আর এধারে শোফার ফাস্টের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দিব্যি দুজনে মিলে ব্যবসা চালাতে লাগ্ল! এমন ব্যাপার পৃথিবীতে প্রায়ই ঘটে, নতুন জিনিস যে গ'ড়ে তোলে তারই বরাতে হয় ফাঁকি—আর যারা উড়ে আসে তারাই এক সময় জুড়ে ব'সে ভোগ-দখল করে।

গুটেনবার্গের ঐ বিয়াল্লিশ-লাইন-বাইবেল ছাপার ঠিক তারিখটা কি-ক'রে জানা গেল সে কথাটা এই ফাঁকে তোমাকে বলে নিই। গুটেন্বার্গ বই ছাপবার সময় তাতে তারিখ দেননি, কাজেই এম্নি সে তারিখটা

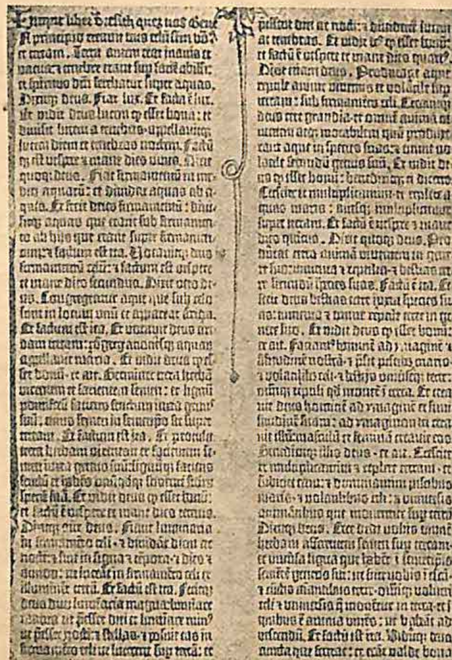
জানবার কোনই উপায় ছিল না, যদি না দু'শ বছর পরে হঠাৎ সেটা জানা যেত!

ষোল-শ' তেতাল্লিশ সালে চতুর্দ্দশ লুই যখন ফ্রান্সের রাজা হলেন তখন তিনি মোটে বছর দশেকের ছেলে, কাজেই তাঁর হয়ে রাজত্ব চালাতেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী ম্যাজারিন। ম্যাজারিন লোকটি ছিলেন খুব বড়লোক, তাঁর বই পড়ার শখও ছিল খুব বেশী। তিনি মরবার পর তাঁর বিরাট লাইব্রেরী যখন অপর লোকের হাতে এল, তখন তাদেরই ভেতরে কেউ বইখানা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ ঐ বাইবেল একখানা দেখতে পায়। সেই বইটির মলাটের ওপর এক পাদ্‌রী বইটি ছাপা হবার তারিখটা টুকে রেখে নাম সই ক'রে রেখেছিলেন। ভাগ্যিস্—নইলে আর কোন উপায় ছিল না ঐ তারিখটা জানবার। মানুষের লেখাপড়ার রাজত্বে এতবড় একটা ঘটনা কবে ঘটল তার কোন হিসেবই থাকত না।

যাই হোক্—গুটেনবার্গ চ'লে গেলেন বটে কিন্তু ফাস্টের দল ছাপাখানা ভালই চালাতে লাগল; কয়েকখানা ভাল ভাল বই ছেপে সারা ইউরোপে বেশ নাম ক'রে ফেল্‌লে। এ খবর অবশ্য চাপাও রইল না। জার্ম্মানীর সব শহরেই ছোট ছোট ছাপাখানা দেখা দিলে। ক্রমশ জার্ম্মেনী থেকে ফ্রান্স, ইটালী



আধুনিক ফ্ল্যাট মেশিন



গুটেনবার্গের ৪২ লাইনের বাইবেল

আরও অনেক দেশে এই আজব ব্যাপারের খবর ছড়িয়ে পড়ল, ছাপার কাজও সব জায়গাতেই শুরু হয়ে গেল।

তখনকার দিনে ছাপাখানা করা কিন্তু সহজ ছিল না। প্রত্যেকটি লোককে নিজের দরকার মত টাইপ বা অক্ষর তৈরি ক'রে নিতে হ'ত, তারপর সেই অক্ষর সাজিয়ে বই ছাপাতে হ'ত। এতে ক'রে সকলকার টাইপ সমানও হ'ত না, সবগুলো একরকম দেখতেও হ'ত না। তা ছাড়া খাটুনিই কি কম হ'ত!

কিন্তু তবু তারা হাল ছাড়েনি। যত্ন ক'রে, খেটে একখানির পর একখানি ভাল ভাল বই ছেপে গেছে, তার মধ্যেই চেষ্টা করেছে যত সুন্দর ক'রে ছাপতে পারে। তারা হাল ছাড়েনি ব'লেই আমরা তখনকার দিনের কত ভাল ভাল বই আজও দেখতে পাই, পণ্ডিত লোকেদের কথা পড়তে পাই।

তারা আবার সেই বইতে ছবি আঁকার উপায়ও বার ক'রে ফেললে। কাঠের টুক্‌রোকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে উল্টো ছবিটা খোদাই ক'রে তারপর তা থেকে ছবির সোজা ছাপ তুলে নিত। এ'কে ব'লত 'উড্‌কাট' বা কাঠ-কাটা ছবি, এখনও এরকম ছবি কেউ কেউ তৈরি করে। কাঠে ছুরি দিয়ে কাট্‌ত বটে, তাই ব'লে

৩

সে ছবি খুব খারাপ হ'ত না। খুব চমৎকার চমৎকার ছবিও কেউ কেউ তৈরি করত, সে ছবি দেখে এখনও আমরা অবাক হয়ে যাই। উডকাট ছবি খোদাই ক'রে যাঁরা খুব নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে টমাস্ বিউইক্ ব'লে এক ভদ্রলোকের হাতের কাজ যদি দেখ ত' তুমি বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে অত সরু সরু লাইনে মানুষ কাঠের ওপর হাতে ক'রে খোদাই করতে পারে! অবশ্য তিনি ছুরি দিয়ে কাঠ কাটতেন না, তখন তামা বা ইস্পাতের ওপরেও ছবি খোদাই হ'ত—সেই ধাতুকাটা যন্ত্র দিয়েই বিউইক্ কাঠে ছবি আঁকতেন।

বই ছাপবার এই সুসংবাদটা যিনি ইংলণ্ডে প্রথম বয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর দুর্দ্দশাটা কি হয়েছিল শুনবে? যাদের এতবড় উপকার করলেন, সেই তাঁর দেশের লোকেরাই তাঁকে জাদুগর ব'লে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল!

তাঁর নাম হ'ল উইলিয়ম ক্যাক্স্টন। জার্ম্মানী থেকে ছাপাখানার কাজ শিখে ফিরে এসে ১৪৭৪ সালে ভদ্রলোক ওয়েষ্টমিনৃষ্টার এবি বা ইংলণ্ডের সবচেয়ে নামকরা গির্জ্জার মধ্যেই একটা ছোটখাট ছাপাখানা খুলে বসলেন এবং বই-ও একখানা ছেপে বার ক'রে দিলেন। ক্যাক্স্টন আগে হাতে ক'রেই বই নকল

ক'রে বিক্রী করতেন। কিন্তু হঠাৎ একখানা বই—বোধ হয় সেটার নাম 'ট্রয়ের ইতিহাস'—এতবেশি কপির বায়না পেলেন যে হিসেব ক'রে দেখা গেল চার-পাঁচ বছরে মধ্যেও সবগুলো নকল ক'রে দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ! তাইতেই তিনি চট্ ক'রে বিদেশে চ'লে গিয়ে ছাপাখানার কাজ শিখে ফিরে এসে সব প্রথম ঐ বইটিই ছেপে বার করলেন।

অতগুলো বই অত তাড়াতাড়ি বাজারে বার ক'রে দিতেই দেশের লোক অবাক হয়ে গেল, আর ভাবলে যে এর মধ্যে সয়তানের কিছু কারসাজি আছে নিশ্চয়ই, নইলে এমনটা হ'ল কি ক'রে? তারা সয়তানের ভয়ে এমনি ক্ষেপে গেল যে 'মার, মার' শব্দে একদিন সবাই ক্যাক্‌স্‌টন্‌কে তাড়া করলে। সে বেচারী ভাল-মানুষ প্রাণের দায়ে গিয়ে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এবিতে আশ্রয় নিলেন। সেইখানেই যন্ত্রপাতি সব নিয়ে গিয়ে তোলা হ'ল। ক্যাক্‌স্‌টন তারপর বহুকাল সেখান থেকে আর বেরুতে পারেননি,—সেইখানেই ব'সে ব'সে বই ছাপতেন আর গির্জ্জার লোকেরা দয়া ক'রে যা খেতে দিত তাই খেতেন।

ভাগ্যে তখন নিয়ম ছিল যে গির্জ্জাতে আশ্রয় নিলে তাকে আর কেউ মারতে পারবে না—তাই ক্যাক্‌স্‌টন

সে যাত্রায় রেহাই পেলেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের তখনকার যিনি রাজা তিনি এ-কাজের উপকারিতা বুঝেছিলেন ব'লেই ক্যাক্স্টন অমন নিরাপদ আশ্রয়ও পেয়েছিলেন।

ক্যাক্স্টন অনেকগুলি বই ছেপেছিলেন। বোধ হয় সবসুদ্ধ ছিয়ানব্বুই খানা বই হবে। এখনকার ছাপাখানায় যেমন একসঙ্গে আটপাতা, ষোলপাতা, এমনকি বত্রিশপাতা পর্য্যন্ত ছাপা যায় তখন তা ছিল না, একখানি ক'রে পাতা ছাপ্‌তে হ'ত, তা'ও হাতে চেপে চেপে; একখানি ক'রে পাতা ছাপা হ'লে আবার হাতে ক'রে অক্ষরগুলোর ওপর কালি মাখিয়ে নিতে হ'ত। যেমন ক'রে এখনকার দিনে ছাপাখানায় প্রুফ বা নমুনাছাপ তোলা হয়, তখনকার দিনে তেম্‌নি ক'রেই বই ছাপা হ'ত।

কিন্তু তবু, এই ভাবেই ক্যাক্স্টন অতগুলি বই ছেপেছিলেন। তিনি মরবার পর তাঁর সাগ্‌রেদ ওয়ার্ডস্ কিছুদিন ঐ ছাপাখানা চালায়। তারপর অবিশ্যি ইংলণ্ডে আরও অনেকগুলি ছাপাখানা গজিয়ে উঠল। ততদিনে দেশের লোকের ভূতের ভয়টাও অনেক কমে' গিয়েছিল।

কিন্তু এই যে সব ছাপাখানা চল্‌ত, এরা বই যে খুব বেশি ছাপ্‌ত তা নয়। মানে, মানুষের লেখাপড়ার খুব

বেশি সাহায্য করত না এরা। তখনও দেশে দলাদলি আর ঝগড়া চলেছে খুব বেশি ; সুবিধা হ'ল সেই সব দলেরই, প্রাণভ'রে ইস্তাহার ছেপে অপরকে গালাগাল দেবার কাজ চল্‌তে লাগ্‌ল খুব জোর।

এই ভাবে প্রায় দুশো বছর ধ'রে বিলেতের ছাপাখানা কোনমতে জবু-থবু হয়ে টিকে রইল—উন্নতি হ'ল না একটুও। কেন না, গালাগালি দিয়ে যে সব ইস্তাহার ছাপা হ'ত তা ভাল করে ছাপা হ'ল কি মন্দ ক'রে ছাপা হ'ল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কে বলো ?

শেষ কালে ১৬২২ সালে এক নতুন জিনিস ছাপাখানা থেকে ছেপে বেরোতে শুরু হ'ল, সে হ'ল প্রথম ইংরেজি খবরের কাগজ—দেশে বিদেশে হুলুস্থুল প'ড়ে গেল।

পাঁচ

তুমি খুব অবাক্ হয়ে গেলে, না ? ভাবছ যে খবরের কাগজ আবার এমন কি জিনিস যাতে এত হৈ চৈ প'ড়ে গেল !

সত্যি, এখন তোমরা রোজ সকালে চোখ খুলেই দেখ ঝক্‌ঝকে ছাপা ইংরেজি-বাংলা দু'খানা খবরের কাগজ তারও আগে তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে গেছে, আর গলির মোড়ে অগুন্‌তি লোক আরও নানারকম খবরের

কাগজ হেঁকে হেঁকে বিক্রী করছে। দুধ খেতে খেতে একবার কাগজখানায় চোখ বুলোলেই পাঁচটি মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশের খবর সব জানা হ'য়ে যায়। এইত রোজ দেখছ, তবে আর এতে এত অবাক্ হবার কি আছে ?

কিন্তু তা নয়। চিরকালই এমনধারা ছিল না, আগে মানুষের দেশবিদেশে যাওয়াও এত সহজ ছিল না, দেশবিদেশের খবরেও এত দরকার ছিল না। সওদাগররা বেচাকেনা করতে যেত নৌকা সাজিয়ে, তারা ফিরে এলে তাদের মুখ থেকে অন্য দেশের যেটুকু খবর পাওয়া যেত, তাই ছিল ঢের। রাজার দরকার হ'লে তিনি বিদেশে লোক পাঠিয়ে নিজের খবর জোগাড় করতেন—তা নিয়ে প্রজাদের মাথা ঘামাবার কোন দরকার হ'ত না।

কিন্তু তবু পৃথিবীর খবর যে জানা দরকার একথা মানুষ অনেক দিনই বুঝেছে। এখন তুমি যতই লেখা-পড়া শেখ না, বড় বড় বি-এ, এম্-এ পাশ করো না কেন, যদি খবরের কাগজ রোজ রোজ না পড়ো তা'হলে কোন মজলিসেই তোমার জায়গা হবে না। দুটো একটা কথা বলবার পরই বেকুব ব'নে তোমায় চুপ ক'রে যেতে হবে।

সব-প্রথম খবরের কাগজের দরকারটা বোঝে চীনেরা। আবার চীনের কথা বল্‌তে হচ্ছে, দেখছ ত !

ওদের মোটেই অমন যা-তা বোলো না, দেখছ ত কত দরকারী জিনিস ওরা প্রথম মাথা খাটিয়ে বার করেছে! বোধ হয় ষোল কি সতের-শ’ বছর আগে চীনে এক-জায়গায় দিন কতক ব্যবস্থা হয়েছিল যে দেশের মোটামুটি খবরগুলো রাস্তার মোড়ে মোড়ে লিখে দেওয়া হবে। তাতে ক’রে সকলেই খবরগুলো জানতে পারত। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশিদিন চলেনি।

এর পর একেবারে মাত্র চারশ’ বছর আগে আমরা প্রথম খবরের কাগজের খোঁজ পাই। জার্ম্মানী ও ইটালীতে ঐ সময় দু-একখানা খবরের কাগজ বার করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু রীতিমত খবরের কাগজ বেরোল, প্রথম ইংলণ্ডেই—ঐ যে বললুম, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে। কাগজখানার নাম ছিল Weekly News, তার মানে হ’লো ‘হপ্তার খবর’। ওঃ—সে কি ব্যাপার! কাগজ ত ছাই, একরত্তি একখানা কাগজের ওপর এক-পিঠে ছাপা কতকগুলো খবর, ছবিও নেই, কোন রকম বিজ্ঞাপনও নেই—সে এক আজব ব্যাপার। কিন্তু তারই জন্যে লোকের কি কাড়াকাড়ি! চায়ের দোকানে, সরাইখানায় কিংবা পথে ঘাটে, কোন লোকের হাতে ঐ একটুকরো কাগজ দেখলেই সকলে মিলে ভীড় ক’রে তাকে ঘিরে দাঁড়াত আর হাঁ ক’রে নিজেদের দেশের বা ফ্রান্স,

ইটালী, জার্ম্মানীর দু'এক টুক্‌রো খবর যেন গিল্‌ত। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে অন্যলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবত যে কেমন ক'রে এরা এত সব খবর জোগাড় করলে!

এর বছর-কতক পরে সার রোজার এষ্ট্রেঞ্জ ব'লে এক ভদ্রলোক Public Intelligencer ব'লে আর-একখানা কাগজ বার করেন, কিন্তু সেও ঐ হপ্তায় একবার বেরোত। দৈনিক কাগজ প্রথম বেরোল ১৭০২ সালে, সেও ঐ ইংলণ্ডেই। Daily Courant তার নাম, সে কাগজ এখন নেই, বহুদিন হ'ল উঠে গেছে। দু'টি পৃষ্ঠার কাগজ, তাতেও এখনকার মত বিজ্ঞাপন বা ছবি থাক্‌ত না। তবে তখন ষ্টীম—মানে জলের বাষ্প—দিয়ে কল চালানো শুরু হয়েছে; ছাপাখানাও কোন-কোনটা তাইতে চল্‌ছিল। তাতে ক'রে ছাপার কাজটা আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছিল ব'লেই দৈনিক কাগজ বার করা সম্ভব হয়েছিল।

এখনকার দিনে যে সব কাগজ বিলেতে চল্‌ছে তার মধ্যে তখনকার দিনের কাগজও একখানা আছে। সে হ'ল 'মর্ণিং পোষ্ট'—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বেরোয়। একটা কাগজ এতদিন ধ'রে চালানো বড় সহজ কথা নয়, কি বলো? বিলেতের লোকেরা সকলেই কাগজ পড়ে, কাগজ

পড়তে ভালবাসে ব'লেই এতদিন একটা কাগজ বেঁচে আছে। ইংরেজরা যে সব গুণে আজ পৃথিবীর ভেতরে সব দিক দিয়েই বড়ো হয়েছে, তার মধ্যে এও একটা। ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড আর ওয়েল্‌সে আজ কতগুলো কাগজ চলেছে জানো—পাঁচ-হাজার! দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক মিলিয়ে অবশ্য—কিন্তু আমাদের এতবড় ভারতবর্ষেও অতগুলো কাগজ বোধহয় একসঙ্গে চলেনি কখনও।

কাগজও বেরোতে আরম্ভ হ'লো, বই ছাপাও জোর চল্‌ল, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত আর একটা অসুবিধে ইংলণ্ড-কে ভোগ করতে হচ্ছিল খুব বেশি, সেটা হ'ল টাইপ বা অক্ষরের। হয় হল্যাণ্ড নয় জার্ম্মানী থেকে ওদের টাইপ আর টাইপের ছাঁচ কিনতে হ'ত, দেশে টাইপ তৈরি করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ওসব দেশের টাইপগুলো দেখতেও ছিল খারাপ, পড়তেও অসুবিধা হ'ত। শেষকালে উইলিয়াম ক্যাস্‌লন ব'লে এক ভদ্রলোক বিলেতেই অক্ষর ঢালবার ছাঁচ তৈরি ক'রে ফেললেন।

টাইপ কি ক'রে তৈরি হয় জান ত? পেতল বা ঐ রকম কোন শক্ত ধাতুর ওপর অক্ষরের ছাঁচ কেটে তাইতে শিসে গরম ক'রে ঢালাই ক'রে অক্ষর তৈরি করা হয়। ছাঁচে যেমন ক'রে চন্দ্রপুলি বা সন্দেশের ফুল তোলে, কতকটা সেই রকম আর কি! কিন্তু তার ছাঁচটা হয়

উল্টো আর অক্ষরের ছাঁচটা হয় সোজা—কেননা অক্ষর-গুলো উল্টো হওয়া দরকার, নইলে আবার কালি মাখিয়ে ছাপবার সময় সোজা পড়বে কি ক'রে ?

উইলিয়ম ক্যাসলন মানুষটির কথা এইবার একটু বলি। ১৬৯২ সালে লোকটির জন্ম হয়। লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেননি কিন্তু ছবি আঁকার হাত ছিল ভাল। বড় হয়ে তিনি এক বন্দুকের কারখানায় নক্সা কাটার চাকুরী পান। তখনকার দিনে কামান-বন্দুকের গায়ে নানা রকম ভাল-ভাল নক্সা কাটা থাকৃত। ক্যাসলন বহুদিন সেইখানেই কাজ করেন। এরই ভেতর একটি ভদ্রলোক কারখানায় কি কাজে এসেছিলেন, তার সঙ্গে টাইপওলা জেমস্ সাহেবের আলাপ ছিল। তিনি ক্যাসলনের হাতের কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলেন, জোর ক'রে ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিলেন জেম্‌স্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে।

এই জেম্‌স্ সাহেবের কাছেই টাইপের কাজ শিখে ক্যাসলন নিজে নতুন ধরণের টাইপের ছাঁচ তৈরি করলেন, এবং ব্রিজওয়েল ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করে নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু ক'রে দিলেন। ওঁর তৈরি করা নতুন নতুন টাইপের ছাপার নমুনা যখন সব ছাপাখানায় পাঠানো হ'ল তখন সকলেই তাঁর টাইপের চমৎকার গড়ন

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই দিন থেকে ক্যাসলনের টাইপই সকলে ব্যবহার করতে লাগল। তুমি যদি এখন লণ্ডন শহরে বেড়াতে যাও ত দেখতে পাবে যে শহরের ঠিক সেই জায়গাটিতেই এখনও ক্যাসলনের কারখানা চল্‌ছে—যদিও ক্যাসলন সাহেব বহুদিন মারা গেছেন।

ক্যাসলনের পর আরও অনেক লোক নতুন টাইপের ছাঁচ দেবার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে ব্যাস্কারভিলের 'ইটালিক' অক্ষরটা এখনও খুব চলে। ঐ যে তোমার গ্রামার বইয়ে কতকগুলো বাঁকা-বাঁকা হেলানো অক্ষর দেখছ—ঐগুলোই ইটালিক।

ছয়

এ পর্য্যন্ত ত গেল অক্ষরের কথা। অক্ষর যদি বা ভাল হ'ল, আরও কতকগুলি অসুবিধা রয়ে গেল খুব বেশি। ভাল ছাপার যন্ত্র, ছবি ছাপবার উপায় না হ'লে ভাল ভাল বই বা খবরের কাগজ তাড়াতাড়ি ক'রে ছাপা যেত না। সেইগুলো কেমন ক'রে হ'ল এইবার সেই কথাই বল্‌ব।

প্রথমে কি ক'রে ছাপা হ'ত তা আগেই বলেছি, বোধ হয় ভোলনি। অক্ষরগুলো ঠিকমত মাপ ক'রে সাজিয়ে রুটি বেলা বেলুনের মত রুল দিয়ে কালি লাগানো হ'ত, তারপর তাতে কাগজ ফেলে চাপ দিয়ে বইয়ের ছাপ

তোলা হ'ত। এখনও প্রুফ (বা ছাপার নমুনা) তোলা হয় সেই রকম ক'রে। তা'ছাড়া রাস্তায় রাস্তায় এখন যে সব বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড দেখতে পাও, তাও প্রায় ঐ রকম ক'রেই ছাপা হয় এখনও। কিন্তু এতে ক'রে ছাপতে দেরি হ'ত যে খুব বেশি তা বোধ হয় আর তোমাকে ব'লে দিতে হবে না। এ অসুবিধে দূর করার জন্যে অনেকদিন থেকে চেষ্টাও চলছিল খুব। শেষকালে আঠারশ' এগারো সালে জার্ম্মানীতে কোনিগ ব'লে এক ভদ্রলোক এক যন্ত্র তৈরি করলেন, তাতে ক'রে সাজানো অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে একটা বেলুন গড়িয়ে গিয়ে আপনা আপনিই কালি মাখিয়ে দিতে পারে। তখন ঐ বেলুন বা রোলার (এখানের ছাপাখানার লোকেরা বলে 'রুল')-গুলোয় চামড়া জড়ানো থাকত, এখন অন্য একটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় তাকে এখানে বলে শিরীষ।

যাই হোক্—এম্‌নি একটু একটু ক'রে এক একজন এক একটা জিনিস এমন মাথা খাটিয়ে তৈরি করলেন যে ধীরে ধীরে ছাপাখানার বহু অসুবিধা দূর হয়ে গেল। এখন এমন ছাপাখানার যন্ত্র তৈরি হচ্ছে যাতে ক'রে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বহু কাগজ ছেপে বেরিয়ে আসতে পারে। আর সব কাজই প্রায় আপনি চলে, মানুষকে শুধু আগে

অক্ষর-সাজানো 'ম্যাটার'টা ঠিক ক'রে লাগিয়ে দিতে হয় আর কাগজগুলো এগিয়ে দিতে হয়। তাও এমন যন্ত্র আছে যাতে কাগজ আপনিই টেনে নেয়—তাকে বলে অটোফিডার।

এখন যে সব ছাপাখানায় সাধারণতঃ আমাদের বই বা মাসিকপত্র সব ছাপা হয়, সেখানে দু'রকমের যন্ত্র থাকে। একটা হ'ল ফ্ল্যাট মানে বড় যন্ত্র আর একরকম হ'ল ট্রিড্‌ল্। একসঙ্গে অনেকগুলো বইয়ের পাতা ছাপতে হ'লে ফ্ল্যাটে ছাপতে হয়, আর ছোট ছোট ছবি, হ্যাণ্ডবিল, ক্যাশমেমো—এম্‌নি সব টুক্‌রো-টুক্‌রো জিনিস ট্রিড্‌ল-এ ছাপা হয়। এ-সবে খুবই তাড়াতাড়ি ছাপা হয় বটে কিন্তু এখন আমাদের খবরের কাগজ আরও তাড়াতাড়ি ছাপার দরকার হয়—ঘণ্টায় কয়েক হাজার ক'রে না ছাপ্‌লে কাগজ সকলকে দেওয়া যায় না, সেই জন্যে আরও এক-রকম ছাপবার যন্ত্র বেরিয়েছে তাকে বলে 'রোটারী'—কিন্তু তার কথা তোমাকে পরে বল্‌ছি।

ছাপবার কাগজেরও আগে দুর্দ্দশা কম ছিল না। কাগজটা তৈরি হয় গাছের ছাল, বাঁশের শাঁস, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, পুরোনো কাগজ এম্‌নি সব জিনিস থেকে। ওগুলোকে গুঁড়িয়ে মণ্ডর মত তৈরি ক'রে ভারী জিনিসের চাপ দিয়ে কাগজ তৈরি করতে হয়। আগে এই সমস্ত

ব্যাপারই হাতে করতে হ'ত—তাতে সময়ও লাগত বেশি, কাগজও তত ভাল হ'ত না। অথচ খরচা বেশি লাগত ব'লে দামও বেশি হ'ত। কোনিগ যে সময়ে ছাপাখানার যন্ত্র তৈরি করলেন সেইসময়-বরাবরই ফুড্রিনিয়ার আর ডন্‌কিন্ ব'লে দু'জন সাহেব কাগজ তৈরি করবার কল বার করলেন।

কলে তৈরি কাগজ মজবুত হ'ল, দেখতে ভাল হ'ল, এধারে সস্তাও হ'ল আগের চেয়ে ঢের বেশি। শুধু তাই নয়, আগে একপাতা একপাতা ক'রে কাগজ হ'ত (মানে যখন হাতে তৈরি হ'ত), এখন কল থেকে লম্বা কাগজের পাত তৈরি হয়ে বরাবর বেরিয়ে যায়, তাকে মাপ ক'রে কেটে নিয়ে তাড়া বা দিস্তা (কিম্বা কুড়ি দিস্তের রীম) বাঁধা হয়। তাই ব'লে হাতে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি আমরা একেবারে ভুলে যাইনি, এখনও কোথাও কোথাও তৈরি হয়। আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলায় এখনও এর চলন আছে।

এই ভাবে কাগজ কল থেকে বেরোয় ব'লেই 'রোটারী' ছাপাখানার জন্যে কাগজের গুলি বা 'রীল' পাওয়াও সহজ হয়েছে। যেমন তোমাদের সেলাইয়ের সুতো কাটিমে জড়ানো থাকে, তেমনি পাঁচ মাইল লম্বা কাগজের ফিতে (সে ফিতে অবিশ্যি চওড়া হয় ঢের) জড়িয়ে খবরের

কাগজ ছাপবার রীল তৈরি হয়। রোটারীতে অক্ষর-সাজানো 'প্লেট'টা বাঁকিয়ে গোল ক'রে দেওয়া হয় আর কাগজের গুলি চালিয়ে দেওয়া হয় তার ওপর দিয়ে খুব জোরে। অক্ষরের প্লেটটা যত জোরে ঘুরতে থাকে তত-গুলো কাগজও ছাপা হয়ে যায় চট্‌পট্—এম্‌নি ক'রেই ঘণ্টায় দশ বিশ হাজার কাগজ ছাপা হয়, আর তোমরা ভোরবেলা চোখ খুলতে না খুলতে দেখতে পাও গলির মোড়ে রাশি-রাশি কাগজ সাজিয়ে বিক্রী করছে।

কিন্তু এসব সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও ছবি ছাপবার ব্যবস্থাটি যদি না করা যেত, তা'হলে লেখাপড়ার কাজ কিছুতেই এতদূর এগোত না। ছেলেমেয়েদের বইয়ে ছবি না থাক্‌লে সে বই তাদের পড়ানো মুশকিল হ'ত। এইত তুমিই—পড়ার বই কিনে আন্‌লেই আগে হাঁ ক'রে তার ছবি দেখতে বসো।

আচ্ছা, সেদিন তোমাদের সব যখন ফোটো তোলা হ'ল—তখন ব্যাপারটা ভাল ক'রে দেখেছিলে কি? একটা অন্ধকার বাক্স, যাকে ওরা ক্যামেরা বলে, তারই মুখে একরকম কাচ লাগানো থাকে, তাকে বলে 'লেন্‌স্', তারই মধ্যে দিয়ে তোমাদের চেহারাগুলোর উল্‌টো ছায়া গিয়ে পড়ল 'প্লেট' বা এক রকমের আরক মাখানো কাচের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছাপটা সেই কাচের ওপর

পাকা হয়ে উঠে গেল। কিন্তু সেটাকে আরও পাকা করার জন্যে অন্য একরকম আরক দিয়ে ধোবার দরকার হয়—আর সেই যে ধোবার পর পাকা ছাপ ওঠে কাচে, তাকেই বলে নেগেটিভ। এরপর আর এক রকম আরক মাখানো কাগজ ঐ নেগেটিভের সঙ্গে লাগিয়ে আলোয় রাখলেই স্পষ্ট ছবি বা ফোটো সেই কাগজটার ওপর উঠে যায়।

ডাগুয়ের ব'লে এক ভদ্রলোক ফোটোগ্রাফীর প্রথম আবিষ্কার করেন কিন্তু তাকে কাজ চালাবার মত ক'রে দাঁড় করান প্রথম জন্ টালবট ব'লে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। কিন্তু সে কথাটায় আমাদের তত দরকার নেই —এই ফোটো তোলবার উপায় থেকেই কেমন ক'রে ছবি ছাপবার কাজটা সহজ হয়ে এল সেই কথাটা এখন শোন।

আগে কি ক'রে ছবি ছাপা হত তা তোমাকে বলেছি। ধাতুর পাতের ওপর একটু একটু ক'রে হাতে ক'রে খোদাই করতে হ'ত। শুধু তাই নয়, সমস্ত ছবিটাই আগাগোড়া উল্‌টো খোদাই করতে হ'ত—তা নইলে সে ছবিটা থেকে সোজা ছাপ পড়বে কেন? ফলে কতটা ঠাণ্ডা মাথা ও হাতের দরকার হ'ত বুঝতে পারছ ত? তবু তাতেই যেসব চমৎকার ছবি ছাপা হয়েছে তা দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

যাই হোক্, ক্রমশ এ ব্যাপারটির সোজা মীমাংসা হয়ে গেল। যে ছবি ছাপা হবে তার ফোটো তুলে নিয়ে সেই নেগেটিভটা মসলা মাখানো জিঙ্ক বা তামার পাতের ওপরে দিয়ে তার ওপর থেকে খুব জোর আলো দিলে ছবিটার একটা ছাপ ঐ ধাতুরই ওপর ওঠে। তখন যে অংশটা কালো থাকবে সেইটে রেখে বাকীটা এ্যাসিডের সাহায্যে গলিয়ে গলিয়ে ক্ষইয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ পাতটা একটা কাঠের ওপর এঁটে টাইপের সঙ্গে সাজিয়ে দিলেই ছবি উঠে যায়।

কিন্তু এ গেল শুধু সাদা-কালো ছবি, তাও কালো রেখার মোটা কাজ ছাড়া এতে আর কিছু ছাপা চলে না। এ'কে বলা হয় লাইন ব্লক। কিন্তু ফোটো এতে ছাপা সম্ভব নয়। কেননা, একটু ভাল ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে, তোমাদের পড়ার বইতে ঐ যে সব ছবি ছাপা হয়েছে, রবিঠাকুর বা বিদ্যাসাগরের ঐ যে সব ফোটো, তাতে সব জায়গায় সমান কালি নেই। আলোছায়ার সুন্দর খেলা রয়েছে ওর মধ্যে—কোথাও খুব কালো, কোথাও বা একেবারেই ফিকে, কোথাও বা মাঝামাঝি। এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তার জন্যে হাফটোন ব্লক দরকার।

যে ফোটোটা ছাপা হবে, তার ব্লকের জন্যে যখন ফোটো

নেওয়া হয় তখন ছবির তারতম্য বুঝে লেন্সের ওপর একরকম জালের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ঐ আচ্ছাদনে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইন টানা থাকে, কতকগুলো থাকে ডাইনে থেকে বামে আর কতকগুলো ওপর থেকে নীচে। তার ফলে পূরো ছবিটার ফোটো ওঠে না নেগেটিভে, জালের যে সরু সরু লাইন তার জায়গায় ওঠে সাদা ছাপ আর তার ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট ফুটকির মত ঐ ছবিটার ছাপ ওঠে। খুব ভাল ক'রে এখন ঐ বইটার ছবির দিকে চেয়ে থাকো, দেখবে সত্যিই অসংখ্য ফুটকি ছাড়া ওগুলো আর কিছুই না। যেখানে ফোটোর ছায়া কম সেখানে ফুটকিগুলোও অস্পষ্ট, আর যেখানে বেশি সেখানে ফুটকিগুলো ঘন কালো। খবরের কাগজের ছবিও দেখবে ঐ ফুটকিরই সমষ্টি। তবে তার জালটা একটু বেশি ফাঁক ব'লে ফুটকিগুলোও ওঠে বড় বড়। এই ভাবে বিন্দুর ছাপ ওঠে ব'লেই, নেগেটিভ থেকে যখন ধাতুর পাতে ছাপ তোলা হয় তখনও বিন্দুর ছাপই ওঠে, আর তার ফলে এ্যাসিডে ক্ষওয়ানোর সময়েও ছায়ার কমবেশি অনুসারে ধাতুটা ক্ষয়ে গিয়ে কাগজে ছাপবার সময়ে ঠিক ফোটোখানির মতই আলোছায়ার ছাপ দেয়। এ'কেই বলে হাফটোন ব্লক।

এতে ক'রে রঙ্গীন ছবি ছাপবারও খুব সুবিধা হয়।

ধরো তোমাদের এই বইটার যে রঙীন মলাট, এতে দেখাচ্ছে অনেকগুলো রং, কিন্তু এটায় মোটে তিনটে রং ছাপা হয়েছে, নীল, লাল আর হল্‌দে। এই তিনটে রং আবার কোথাও কোথাও নানারকম ভাবে মিশে অন্য রঙ্গের মত দেখাচ্ছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, তিনটে রঙ্গের তিনখানা ব্লক আলাদা আলাদা ছাপতে হয়েছে এই ছবিটার জন্যে। সে ব্লক কি ক'রে তৈরী হয় জানো? সেটা ঠিক হয়ে যায় ফোটো তোলবার সময় ক্যামেরাতেই। লাল রঙ্গের পর্দ্দা পরিয়ে দিয়ে এই ছবিখানার ফোটো নিলে লাল রংটা বাদ দিয়ে অন্য রংগুলোর ছাপ উঠবে। লাল রঙ্গের জায়গায় উঠবে সাদা ছায়া, তাই নয় কি? এমনি ক'রে তিনবার তিন রঙ্গের পর্দ্দা দিয়ে তিনখানা নেগেটিভ নিলেই তিনটে রঙ্গের ছাপ আলাদা আলাদা পাওয়া যাবে। তা থেকে তিনখানা ব্লক ক'রে নিয়ে একই কাগজে একই জায়গায় তিনটে রং পর পর ছাপলেই তিনরঙ্গা ছবি ছাপা হয়ে যাবে। এতে ক'রে ব্যাপারটা কতই সহজ হয়েছে, অথচ ধরো সেই গুটেনবার্গ বা ক্যাক্সটনের আমলে কত ঝঞ্ঝাট ছিল রঙীন ছবি ছাপার। প্রত্যেকটি পাতা ছাপার পর হাতে ক'রে ক'রে রং দিয়ে এঁকে দিতে হ'ত।

শুধু তখন কেন, এই সেদিনও, আমাদের দেশে যখন 'মুকুল' ব'লে মাসিকপত্র বেরোয় ছেলেদের জন্য—ধরো

সে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—তখন মুকুলে ছবি ছাপা হ'ত কাঠের ব্লকে। একবার সম্পাদকের সখ হ'লো তাঁরা রঙ্গীন ছবি দেবেন। কী করতে হ'ল তার জন্যে জানো? আগে কাঠের ব্লকে ছবিগুলো ছেপে নিয়ে প্রত্যেকখানা কাগজে হাতে ক'রে ক'রে রং দিয়ে দেওয়া হ'ল। আর এখন—এখন ব্লকের মার-প্যাঁচে কুড়ি, পঁচিশ এমন কি ত্রিশ রকমের রংও দেখানো চলে ছাপায়।

রঙ্গীন ছবি ছাপার যে বিবরণ দিলুম সবই এই ভাবে ছাপা হয় বটে কিন্তু ম্যাপ বা এ্যাটল্যাস ছাপা হয় অন্য ভাবে। এক রকম পাথরের ওপর ব্লক ক'রে এমন ভাবে ছাপা হয় যাতে সব রকম রংই একসঙ্গে ছাপা চলে। এ'কে বলে লিথোগ্রাফী, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সেনিফেল্ডার নামে এক ভদ্রলোক প্রথম এইভাবে ছাপার ব্যবস্থা করেন।

সাত

কিন্তু ছাপার ব্যবস্থা হ'তেই লেখাপড়ার কাজ যথেষ্ট এগোল না। মানুষ চায় আরও তাড়াতাড়ি, আরও জোরে চলতে। মুখে মুখে বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা সব দেশেই

আছে। কখনও কখনও সে সব বক্তৃতা আগে লিখে তারপর বক্তা পাঠ করেন। কিন্তু অনেক সময়ে তা সম্ভব হয় না—বক্তাকে তখন-তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হয়। আর তাই যাঁরা পারেন, তাঁদেরই আমরা বড় বক্তা বলি। এ রকম বক্তা সব সময়ে সব দেশেই ছিলেন, আজও আছেন। কিন্তু আগেকার দিনে এসব বক্তৃতা, সেই বিশেষ সভায় যাঁরা থাকতেন না, তাঁরা কিছুই শুনতে পেতেন না। কারণ বক্তারা এত দ্রুত বলতেন যে শুনতে শুনতে তা লিখে নেওয়া সম্ভব নয়। এম্‌নি ক'রে বহু বিদ্বান্‌ মনীষীর অনেক ভাল ভাল কথাই হারিয়ে গেছে—তার কিছুই আজ আর ফিরে পাওয়ার উপায় নেই।

ওদেশের কথা ছেড়েই দাও, আমাদের দেশেও সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, কেশব সেন প্রভৃতি নেতাদের অনেক ভাল ভাল কথাই আজ আর শত চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এমন কি, এই কিছুদিন আগেকার কথাই বলি শোনো। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মানুষ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ায় আমাদের দেশ থেকে খুব বড় জয়ন্তীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মানে তাঁর আরও দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে একটি সাতদিন-ব্যাপী উৎসব চলেছিল কলকাতা

শহর জুড়ে—সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার! এই উৎসবের শেষ দিনে সমস্ত দেশবাসীর আন্তরিক পূজার জবাবে কয়েকটি কথা বলেছিলেন কবি। সেগুলো ছাপাই হয়েছিল আগে থাকৃতে, বইয়ের মত ক'রে। কিন্তু যেটুকু লেখা আর ছাপা হয়েছিল সেটুকু পড়া যখন শেষ হয়ে গেল, তখনও কবি থামলেন না, মনের আবেগে তখনই তখনই কথা বানিয়ে ব'লে গেলেন। আর সেই কথাগুলিই হয়েছিল সব চেয়ে দামী, সব চেয়ে ভাল—দেখ, এখনও সে কথা মনে প'ড়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! অথচ, তখন কেউই প্রস্তুত ছিল না ব'লে সে কথাগুলি আর লিখে রাখা হয় নি—সেই কয়টি অমূল্য কথা মানুষের এই অসংখ্য কথার সমুদ্রে চিরকালের মত হারিয়ে গেল!

কিন্তু যাই হোক্—এ অসুবিধাও মানুষ দূর ক'রে ফেললে শীগ্‌গিরই। 'শর্টহ্যাণ্ড' লেখার সৃষ্টি হ'ল। এবারে মানুষ ফিরে গেল সেই আদিম যুগে! মানে আগে যেমন এক-একটি শব্দের বদলে এক একটি চিহ্ন দিয়ে সেই শব্দকে বোঝানো হ'ত তেমনিই এখন আবার নতুন ক'রে শব্দের বদলে চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। একটা শব্দে ধরো আটটা, দশটা কি বারোটা অক্ষর আছে, সেগুলো লেখা হবার আগেই বক্তা ত অন্য শব্দে গিয়ে পড়বেন। কারণ, লিখতে যতটা সময় যায়, বলতে ততটা

যায় না। কিন্তু চিহ্নটা সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া যায়। এই ভাবে লেখার ব্যবস্থাই হ'ল শর্টহ্যাণ্ড। এই চিহ্নগুলি যদি বেশ নিয়ম মত ঠিক ক'রে রাখা যায়, তাহ'লে যে-কেউ (মানে, যে এই শর্টহ্যাণ্ড জানে) তা দেখে শব্দ বসিয়ে মূল কথাগুলি আবার ঠিক ক'রে নিতে পারবে।

শর্টহ্যাণ্ডে লেখার দরকার মানুষ বুঝেছে অনেকদিন থেকেই। এ চেষ্টাও অনেকেই করেছেন। এখন থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে ইউরোপের অনেকেই এক-একটা প্রণালী বার করেন, তার মধ্যে ম্যাসন আর গার্নের প্রণালীই কিছু খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু ১৮৩৭ সালে পিটম্যানের প্রণালী বেরোতে দেখা গেল সেইটেই সবচেয়ে সোজা, এখন সারা পৃথিবীতে সেইটেই চলছে। সম্প্রতি বাংলাতেও শর্টহ্যাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শর্টহ্যাণ্ড যেমন হ'ল, তেমনি দ্রুত ছাপার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার হ'য়ে পড়ল। ছাপার প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল হাতের-লেখার চেষ্টা মানুষ ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে সরকারী চিঠিপত্র বা ব্যবসার চিঠি-চাপাটি নিয়ে ভারি গোল বাধ্‌ল। একজনের লেখা আর-একজনের পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্যে ভুল-ভ্রান্তিও হয় অনেক রকম।

তখন বেরোল টাইপ-রাইটিং। একসার ঢালাই অক্ষর একটা বাক্সের মতন জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয় এমন ভাবে যে ঐ এক একটি অক্ষরের এক-একটি চাবি টিপলে একই জায়গায় ঐ অক্ষরগুলি গিয়ে ছাপ দেয়—রিবন বা কালিমাখানো ফিতের ওপর দিয়ে। পর পর অক্ষর টিপে গেলে ঠিক পর-পরই যাতে ছাপ পড়ে সেই জন্যে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে,একটা অক্ষরের ছাপ পড়লে, কাগজ লাগানো থাকে যে রুলটায়, সেটা আপনিই একটু স'রে যায়—ফলে শব্দগুলি ঠিক ঠিক সাজানো হয়! এই টাইপরাইটারের যন্ত্রটি প্রথম আবিষ্কার করেন শোল্‌স্—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।

হাঁ—যন্ত্রের কথা হ'তে হ'তে একটা কথা ব'লে নিই। লেখাপড়ার মধ্যে সব চেয়ে যেটা তোমার কাছে শক্ত লাগে, অঙ্ক কষা, সেটাও যন্ত্রে হয় তা জানো কি? অবিশ্যি সব অঙ্ক না হোক্—যোগ করাটা খুব সহজেই যন্ত্রে চলে। এখন ত প্রায় সব অফিসেই এ যন্ত্রটা আছে, এমন কি সাধারণ খাবারের দোকান-হোটেলে পর্য্যন্ত এর চলন হয়েছে। এই ধরণের যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্যাস্কাল—১৬৪২ সালে, এখন থেকে ঠিক তিনশ' বছর আগে।

থাক্—যা বলছিলাম, টাইপরাইটারের কথা। এটি ত

হ'ল। এই যন্ত্র থেকে আর একটা কি চমৎকার জিনিস তৈরী হ'ল জানো?—লাইনোটাইপ মেশিন। এতে ছাপার কাজ এতদূর এগিয়ে গেল যে বলবার কথা নয়। টাইপ-রাইটারে যেমন একটা ক'রে চাবির ডগায় একটা ক'রে অক্ষর লাগানো আছে, আর চাবিটা টিপ্‌লেই অক্ষরটা ছুটে গিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দেয়, লাইনোতে তেমনি চাবি টিপ্‌লেই অক্ষরের ছাঁচগুলো ছুটে গিয়ে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমে একটা শব্দ এবং শব্দগুলো সারবন্দী হয়ে একটা লাইনের সম্পূর্ণ ছাঁচ তৈরী হয়ে যায়। এখানে লাইন বলতে আমি একটা পাতার বা খবরের কাগজের একটা কলমে একসঙ্গে যতখানি চওড়া লাইন ছাপা যায় সেই লাইন বলছি—কারণ এর লাইন প্রয়োজন মত ছোট বড় হতে পারে।

যাই হোক্, এই লাইনের ছাঁচটি সম্পূর্ণ হ'লেই যন্ত্রের অন্যপাশে যে শীসে সর্ব্বদা গলানো অবস্থায় থাকে, একটা নলে ক'রে সেই শীসে এসে ঐ ছাঁচের মধ্যে পড়ে আর দেখতে দেখতে সমস্ত লাইনটা চমৎকার জ'মে যায়। তখন সেটা বার ক'রে ঠিক পরপর সাজালেই একেবারে তৈরী 'ম্যাটার' পাওয়া যায়। তা-থেকে যতটা খুশী ছাপো, ছাপা শেষ হয়ে গেলে আবার সেটা গলাতে দাও, আবার নূতন ক'রে তৈরী করো—এম্‌নি ভাবেই চলে।

ছাঁচগুলোও, কাজ শেষ হয়ে গেলে, আবার যন্ত্রের কৌশলেই ফিরে গিয়ে যে যার নিজের ঘরে বিশ্রাম করে এবং আবার কখন ডাক পড়বে সেই অপেক্ষা করে।

এতে ক'রে শুধু যে তাড়াতাড়ি কম্পোজ করা এবং ছাপা যায় তাই নয়, প্রত্যেকবারই নতুন অক্ষর পাওয়া যায়, তার ফলে ছাপা হয়ও খুব সুন্দর। আজকাল ইংরাজী খবরের কাগজ সবই এবং কোন কোন বাংলা কাগজও এই ভাবে ছাপা হয় ব'লে অত ঝর-ঝরে পরিষ্কার ছাপাটি দেখা যায়। রোটারীতে ছাপাতে গেলে এই ভাবে ঢালাই 'শ্লাগ' বা লাইন দিয়ে যখন এক একটি পাতার ম্যাটার সবটা সাজানো শেষ হয় তখনই তা থেকে একটা বড় ছাঁচ তোলা হয়। সেই ছাঁচটাকে আবার অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়ে তা থেকে শীসে গলিয়ে অক্ষরের পাতটা তৈরী হয়। তখন সেই পাতগুলোকে গোল করে সাজিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই বিদ্যুদ্‌বেগে ছাপার কাজ চল্‌তে থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মার্গেন্‌-থেলার ব'লে একটি ভদ্রলোক লাইনোটাইপ প্রথম বার করেন মাথা ঘামিয়ে।

লাইনোতে যেমন একটা লাইনের গোটা ছাঁচ তৈরী হ'লে তবে তা থেকে 'শ্লাগ' তৈরী হয়, মনোটাইপ ব'লে

একটি যন্ত্র আছে তাতে তেমনি আলাদা আলাদা অক্ষর ঢালাই হবার পর সেগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে সমস্ত ম্যাটারটা তৈরী ক'রে দেয়!

এই সব যন্ত্রে অবশ্য সব চেয়ে সুবিধা হয়েছে খবরের কাগজের। কারণ খবরের কাগজ খুব তাড়াতাড়ি না ছাপা হ'লে চলে না। আগেকার মত হাতে ক'রে ক'রে একটি একটি অক্ষর সাজিয়ে কম্পোজ ক'রে ফ্ল্যাট মেশিনে ছেপে আবার সেই পুরোনো টাইপগুলো ভেঙ্গে হাতে ক'রে ক'রে যথাস্থানে রেখে দিতে গেলে আর এত সকালে কাগজ ছেপে বার করা সম্ভব হ'ত না—এত কাগজ জোগান দেওয়াও শক্ত হ'ত।

খবরের কাগজের কথা যখন উঠলই, তখন আর দু-একটা কথা বলে নিই। খবরের কাগজ যে আজকাল শিক্ষার সব চেয়ে বড় অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা তোমাকে আগেই বলেছি। এই কাগজওয়ালারা খবরগুলো কেমন ক'রে পায় তা জানো কি? তার জন্য খবরওয়ালা আছে। সব দেশে, সব শহরে, এমন কি ছোট ছোট গ্রামেও কখনও না কখনও খবর দেবার মত দরকারী ঘটনা ঘটে। কিন্তু সেই সব জায়গাতে যদি খবর

পাঠাবার লোক না থাকৃত তাহ'লে সে সব খবরগুলো পাবার কোন উপায়ই থাকৃত না, আর কোন কাগজের পক্ষেই সম্ভব হ'ত না—তা সে যত বড় কাগজই হোক্— ঐ সমস্ত জায়গায়, লক্ষ-লক্ষ গ্রাম বা শহরে, মাইনে দিয়ে লোক রাখা, খবর জোগাড় ক'রে পাঠানোর জন্যে।

এর ব্যবস্থাও মানুষ শীগ্‌গিরই ক'রে ফেললে। কতকগুলি ব্যবসাদার ঠিক করলেন, তাঁরাই প্রত্যেক জায়গায় লোক রেখে খবর জোগাড় করবেন, এবং উপযুক্ত দাম নিয়ে কাগজওয়ালাদের কাছে সেই সব খবর বেচবেন। পৃথিবীর সব খবরের-কাগজওয়ালারাই এঁদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে খবর কেনেন ব'লে তাঁরা খুব কম টাকা দিলেও এঁদের চ'লে যায়। তাতে কাগজওয়ালাদেরও খরচা কম হয়, এঁদেরও পুষিয়ে যায়। এখন যে সব কোম্পানী এই ভাবে খবরের ব্যবসা করেন তার মধ্যে রয়টারই সব চেয়ে বিখ্যাত। আমাদের দেশেও এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস, ইউনাইটেড্ প্রেস প্রভৃতি কতকগুলি কোম্পানী আছেন যাঁরা এই কাজ করেন। এ ছাড়াও অবশ্য, বড় কাগজওয়ালাদের খুব বড় বড় শহরে নিজেদের মাইনে করা লোক রাখতে হয়, নইলে অপর কাগজের ওপর টেক্কা দিতে পারেন না।

এই সব খবর কি ক'রে এত তাড়াতড়ি আদান-প্রদান করা হয় জানো ? প্রথম-ত টেলিগ্রাফ করাই ছিল এক-মাত্র উপায় আর এখনও সেটাই প্রধান উপায় আছে। টেলিগ্রাফ অবশ্য তারেও হয় বেতারেও হয়—মোদ্দা খবরটা জোগাড় হয় টেলিগ্রাফেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণত সোজাসুজিই 'তার' আসে, যখন কোন জরুরী খবর বা গুপ্ত খবর দিতে হয় তখন অবশ্য কোড বা সাংকেতিক লিপি ব্যবহার করা হয়—তাতে কম খরচে তাড়াতাড়ি অনেক খবর দেওয়া যায়, খবরটা গোপনও থাকে। যারা সেই বিশেষ সঙ্কেতটি জানে না, তারা সে খবর পড়বে কেমন ক'রে বলো ?...ছবিও আজকাল অনেক সময়ে 'তারে'ই চলে আসে।...হাফটোন ছবির ব্লক করার সময় যে বিন্দুর কথা বলেছিলুম, মনে আছে ত ? সেই ব্যাপারটাকে মূল ক'রেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গে এক-একটি বিন্দুর ছাপ দিয়ে ছবি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংখ্য বিন্দু খুব কাছাকাছি, প্রয়োজন মত হাল্কা বা গভীর ভাবে, যদি ছাপ দেওয়া যায়—তাহ'লে একটা ঢালা ছবিই তাতে ফুটে উঠবে না কি ?

যাই হোক্, এতে ক'রে ত বিদেশ থেকে খবর এল। তারপর, সেগুলো খবরের কাগজের অফিসে অফিসে পাঠানোর উপায় কি ? আগে করা হ'ত—বড় বড় শহরে

খবরওয়ালাদের যে অফিস থাক্‌তো সেইখানে তারে খবর আস্‌ত—তাঁরা টেলিফোন ক'রে হোক্‌ লোক দিয়ে হোক্‌ আবার সেগুলো বিলি করতেন। এতে প্রথমত লোক লাগ্‌ত খুব বেশি, দ্বিতীয়ত বাজেখরচার শেষ থাক্‌ত না। ধরো বিলেত থেকে খবরটা একবার টেলিগ্রাম ক'রে এল বোম্বে অফিসে, বোম্বে থেকে আবার এক এক দফা টেলিগ্রাম করতে হ'ল—কত খরচা! এখন সে জায়গায় একটি ক'রে যন্ত্র খবরেরকাগজের অফিসে রেখে দিলেই চলে। সে যন্ত্রটি আর কিছু নয়—টেলি-প্রিণ্টার! টাইপরাইটারের মতই ব্যাপার—তবে তা টাইপ করা হয় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে, খুব দূরে ব'সে। ডালহাউসি স্কোয়ারে ব'সে একটা ক'রে চাবি টিপলে একই সঙ্গে বাগবাজার-শ্যামবাজার-চেতলায়, যেখানে যতগুলো ঐ কল আছে সবেতে ছাপা হতে থাক্‌বে, এবং একটা ক'রে খবর পাঠানো শেষ হ'লে, যেটুকু কাগজে সেই বিশেষ খবরটি ছাপা হয়েছে, সেইটুকু কাগজ ছেপে আপনিই বেরিয়ে আসবে। কত সুবিধে বলো দেখি!

আট

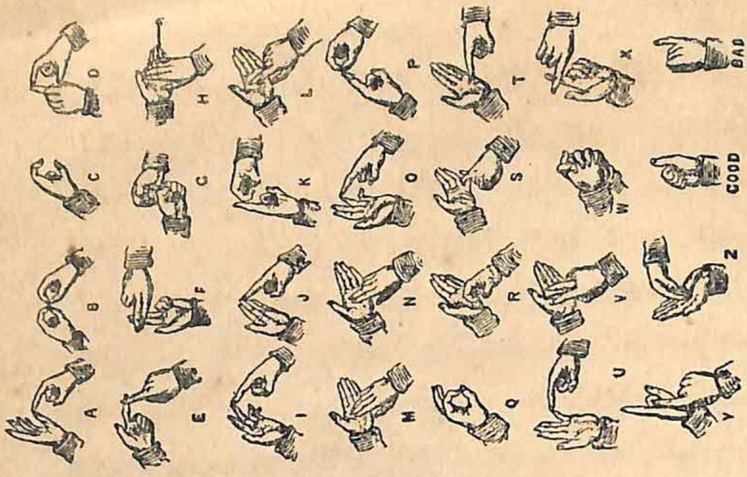
এতক্ষণ ত শুধু ছাপা, যন্ত্র, আর খবরের কাগজের কথাই বলে গেলাম। এবার আবার লেখাপড়ার কথাতে ফিরে যাওয়া যাক্।

প্রথমেই ধরো অন্ধদের শিক্ষার কথা। তোমাদের যাদের চোখ আছে, তাদের জন্য বই, খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, সব কিছুই আছে, কিন্তু যাদের চোখ নেই তারা কি করবে? আগে তাদের প'ড়ে শোনানো ছাড়া শিক্ষা দেবার কোন উপায়ই ছিল না। নিজেদের পড়া বা লেখা সম্ভব হ'ত না কারুরই। এখন থেকে কিছু-কম-দেড়শ' বছর আগে ১৮০৯ সালে ফরাসী দেশে লুই ব্রেইল ব'লে একটি অন্ধ ভদ্রলোক জন্মেছিলেন—তিনি এর প্রতিকার করলেন প্রথম। জন্মাবার সময় তিনি অন্ধ ছিলেন না ঠিক, কিন্তু তিন বছর বয়স হ'তে না হ'তেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি চ'লে গেল। ভদ্রলোকের জ্ঞান-পিপাসা ছিল খুব বেশি—তিনিই অনেক মাথা ঘামিয়ে একটা উপায় বার করলেন। মোটা কাগজে ছুঁচের মত কোন জিনিস দিয়েও যদি ফুটো করা যায়, সে গর্ত্ত আঙ্গুলে ধরা পড়ে ঠিকই। এই রকম ছটি ফুটোই নানা রকম করে সাজিয়ে ওদের বর্ণমালা তৈরী করা হ'ল এবং সেই

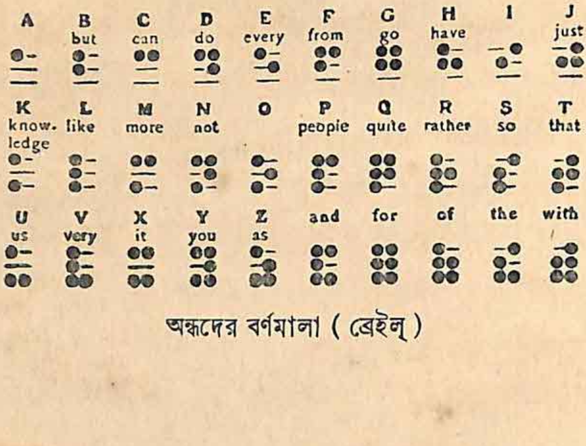
বর্ণমালা দিয়েই বই ছাপার কাজ চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু শুধু ত পড়লেই চলবে না, লিখতেও ত হবে—সে জন্য এমন একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, টাইপরাইটারের মত, যাতে ক'রে সকলেই ইচ্ছামত লিখে নিতে পারে।

বাংলাতে ব্রেইল প্রণালী ধ'রে প্রথম বর্ণমালা তৈরী করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যদিও সেটা ঠিক চলেনি। ১৮৯৪ সালে লালবিহারী সাহা যে প্রণালী ঠিক করেন, তাই এখন প্রচলিত আছে। অবশ্য এ প্রণালীও ব্রেইলের পদ্ধতি ধ'রেই করা হয়েছে, এবং বোধ হয় রামানন্দবাবুরও সাহায্য নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ব্রেইলের আগেও কেউ-কেউ এ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু ব্রেইলের প্রণালীই সবচেয়ে ভাল ব'লে পৃথিবীর সব লোকই সেটা মেনে নিয়েছে।

অন্ধর পরেই যাদের লেখাপড়া শেখানো মুশ্‌কিল তারা হচ্ছে কালা আর বোবা। জন্মাবধি যারা কালা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোবাও হয়—কারণ কথা ছেলেরা শুনেই উচ্চারণ করতে শেখে, যে একটা কথাও শুনলে না সে বল্‌বে কি করে? এদের মধ্যে অবশ্য যারা কথা বল্‌তে জানে তাদের শেখানো খুবই সহজ, ঠোঁটের নড়া দেখেই তারা অনেক সময় কথা বলতে পারে। যারা তা জানে না তাদেরও আজকাল ঠোঁটের



কালা-বোবাদের বর্ণমালা



অন্ধদের বর্ণমালা (ব্রেইল্)

ভঙ্গী বা স্বরের উচ্চারণের সময় গলার শিরা পেশী প্রভৃতির অবস্থান দেখিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করা হয়। মোটের ওপর কালা-বোবাদের অক্ষর চেনানোর সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে হাত ও আঙ্গুলের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত করা। ধরো, দুটো আঙ্গুল এক রকম ক'রে নাড়লে সে 'অ' বুঝবে, একটা আঙ্গুল সেই রকম ক'রে নাড়লেই বুঝবে 'আ'। এই ভাবে শুধু চোখের সাহায্যে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়।

কিন্তু ঠিক কালা বোবা বা কানা নয় অথচ সব দিকেই মাঠো এমন ছেলেও ঢের আছে। আগে তাদের সকলকার সঙ্গে এক গাদাতেই দেওয়া হ'ত—ফল হ'ত এই যে, তাদের জন্যে অনেক সময়ে ভাল ছেলেদেরও পিছিয়ে থাকতে হ'ত—আর অধিকাংশ সময়েই যা হ'ত বা হয়—ভাল ছেলেরা এগিয়ে যায়, তারা পেছোতে পেছোতে এক সময় মা সরস্বতীকে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয়। সেই জন্য এখন সবাই ভেবে চিন্তে ঠিক করেছেন যে এই রকম ছেলেদের আলাদা শেখাতে হবে—এবং যার যে ভাবে শিক্ষাটা মাথায় যায় সেই ভাবেই তাকে সব জিনিস পড়াবার চেষ্টা করতে হবে।

এই ত গেল কালা-কানা-বোবা-বোকাদের কথা। কিন্তু ছোট ছেলেপুলে, যাদের চোখ কান দুই-ই আছে, তাদের লেখাপড়া শেখানোও বড় সহজ কাজ নয়। এই ত তুমি, এত বড় ছেলে হয়েছ তবু লেখাপড়া শিখতে কী ঘোরতর আপত্তি তোমার। আর যখন ছোট ছিলে তখন ত কথাই নেই—কী মার-ধোর, কি বকাবকি, বাব্বা! এখনও, ঐ শোন কান পেতে, তোমার ছোট ভাই বাচ্চু কি চেঁচানোই চেঁচাচ্ছে! কিন্তু এইভাবে মার-ধোর আর চেঁচামেচিতে পড়াশুনো মোটেই ভাল হয় না। লেখাপড়াটা এমন বিভীষিকা হয়ে ওঠে ছেলেমেয়েদের কাছে যে, বড় হয়ে, যখন লেখাপড়ার মূল্য ভাল ক'রেই বোঝবার কথা, তখনও তাদের আতঙ্ক যায় না। মা সরস্বতীর সঙ্গে চিরকালের বিরোধ থেকে যায়।

ছোট-ছোট শিশুদের শেখানোর অসুবিধা অনেকদিন ধ'রেই মানুষ ভোগ করেছে আর উপায় খুঁজেছে লেখা-পড়াটা তাদের কাছে লোভনীয় ক'রে তোলার। বড় হ'লে তবু গল্পের মধ্য দিয়ে শেখানো যায়—কিন্তু যাদের অক্ষর-পরিচয়ই হয়নি তাদের নিয়ে কি করবে? অক্ষরের সঙ্গে ছবি বা ছড়া দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করা ইদানীং চলেছে বটে, আগে তাও ছিল না। প্রথম একটা সহজ এবং লোভনীয় উপায় বার হয় জার্ম্মানীতে, ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে।

ডাক্তার ফ্রোয়েবেল্ ব'লে এক ভদ্রলোক (জন্ম ১৭৮২) প্রথম ভেবে দেখলেন যে, লেখাপড়াটা শুধু যদি খেলা ক'রে দেওয়া যায়—তাহ'লে শিশুরা সেটাকে খেলা মনে ক'রেই মেতে উঠবে, অথচ খেলার আড়ালে যে শিক্ষাটা তাদের মনের মধ্যে বসবে তা সহজে ভুলবে না তারা। এই ধরণের একটি স্কুল তিনি করলেন, তার নাম দিলেন কিণ্ডার-গার্টেন—ঐ জার্ম্মান শব্দটির মানে হ'ল শিশুদের বাগান, আর ঐ নামটি থেকেই শিক্ষাদানের এই বিশেষ পদ্ধতিটির নাম হয়ে গেছে কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালী।

সেই স্কুলে শুধুই খেলার ব্যবস্থা করা হ'ল। তারা ব্যায়াম করবে না, শুধু নাচবে আর দৌড়োদৌড়ি করবে। তারা বাগান তৈরী করবে নিজের হাতে, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় সহজে হয়। নানা রং দেখে' তাদের রঙ্গের তফাৎ শেখা হবে, গুটি নিয়ে খেলা ক'রে যোগ শিখ্‌বে তারা, বড় পিস্‌বোর্ডের অক্ষর তিনটুক্‌রো ক'রে কেটে তাদের বলা হবে টুক্‌রোগুলো জুড়ে অক্ষরটা গোটা করতে—এম্‌নি ক'রে কখন যে তাদের অক্ষর-পরিচয় হবে, তা তারা বুঝতেও পারবে না।

ছেলেমেয়েরা এই ভাবে খেলার মধ্যে দিয়ে পড়া-শুনোকে খুব সহজে মেনে নিলে। তার ফলে সব দেশেই এই পদ্ধতিটি ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে পৃথিবীর

প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে শিশুদের এই ধরণে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হ'ল, আমাদের দেশেও কোথাও কোথাও এই ধরণের স্কুল হয়েছে, তা ছাড়া পুরোপুরি না হ'লেও কতকটা এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক জায়গাতেই হয়েছে।

সকলেই মেনে নিলেন বটে, কিন্তু ইতালীতে মাদাম মন্তেশ্বরী বলে একটি মহিলা (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ওঁর জন্ম) ফ্রোয়েবেলের সঙ্গে ঠিক একমত হ'তে পারলেন না। তিনি যে প্রণালীটির প্রচলন করলেন তাকে তাঁর নাম অনুসারেই নাম দেওয়া হ'ল মন্তেশ্বরী প্রণালী—এবং সেটিও বহু দেশে চালানো হচ্ছে। অনেকে বলেন যে কিণ্ডার-গার্টেনের থেকে মন্তেশ্বরীর ব্যবস্থাই ভাল।

মন্তেশ্বরী বলেন যে, শুধু খেলাধুলো নাচগানে ছেলে-মেয়েদের স্বভাব বড় চপল হয়ে যায়, লেখাপড়া শেখানোর ঐ একমাত্র উপায় নয়, ছেলেমেয়েরা যখন খুব ছোট থাকে, হাতের কাছে যা পায় তাই তারা হাত দিয়ে দেখে। এই স্বভাব একেবারে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তার এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে জ্ঞান-পিপাসা ব'লেই ধরা উচিত এবং এই পথ ধ'রেই তার জ্ঞান-পিপাসা ও কর্ম্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে যাওয়া দরকার। এই ব্যবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয় নতুন

প্রণালীতে—ধরো একটা জামা দিয়ে তাদের বলা হ'ল বোতামগুলো ঠিকমত লাগাতে ; তারা হয়ত প্রথমটা ভুল করলে, একটা ঘর বাদ দিয়ে লাগিয়ে যাবার পর তারা দেখলে যে একটা বোতাম বাকী থাকছে, তাছাড়া জামাটাও রয়েছে কুঁচকে। তখন নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরে তারা আবার খুলবে, আবার ঠিক ক'রে পরাবে। এতে ক'রে বোতাম ও বোতাম গলাবার ঘর যে হিসাব ক'রে বসানো হয় এটা তারা বুঝবে। তারা নিজেদের অনেক কাজ নিজেরা করে—ভুলচুক ত হয়ই, তাদের শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে চেষ্টা করেন যে তারা যাতে তাদের সে ভুলচুক নিজেরাই বুঝে নিজেরা প্রতিকার করতে পারে ; এই ব্যবস্থায় শিক্ষকরা ঠিক শিক্ষক নন্—সহচর মাত্র।

মন্তেশ্বরী ছেলেমেয়েদের কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখবার পক্ষপাতী, এতে ক'রে নাকি তারা শান্ত ও চিন্তাশীল হয়ে ওঠে। এরাও বাগান করে নিজের হাতে ; ফুল ফল গাছপালার চেহারা-স্বাদ-গন্ধে যে পার্থক্য, তার সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই পরিচিত হয়। এছাড়া এদের কতকগুলি যন্ত্র আছে, এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে এদের স্বাভাবিক যে সব ক্ষমতা, বুদ্ধি, তাকে বাড়ানো হয়।

এই দুটি প্রণালীই এখন সর্ব্বত্র চলেছে বটে কিন্তু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর আরও সহজ, আরও ভাল কোন প্রণালী বার করবার জন্যে অনেক পণ্ডিত লোকই মাথা ঘামাচ্ছেন। তুমি হয়ত বলবে যে, ছোট ছেলেদের নিয়ে বুড়ো লোকদের এত মাথাব্যথা কেন? কিন্তু তা নয়, ছোট ছেলেরা যে বড় হয়, তারাই একদিন দেশের নেতা, অধ্যাপক, কবি, শিল্পী, ধর্ম্মপ্রচারক হয়—তা ভুলে যাও কেন? এই যে আমাদের দেশে অন্য সব দেশের অনুপাতে লেখাপড়া জানা লোক সব চেয়ে কম, তার কারণ কি? অন্য সব সভ্যদেশে এই শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে বাধ্যতামূলক—মানে সবাইকেই লেখাপড়া শিখতে হবে বাপমায়ের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্। বাপমায়ের ক্ষমতা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ সে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার খরচা দেশের সরকার দেন।

অথচ, মজা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশই একদা শিক্ষা ও জ্ঞানে সব দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমন কি মুসলমান আমলেও এদেশে লেখাপড়ার যেবিশেষ চর্চ্চা ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অথচ ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম দিকে এই দেশই এমন অশিক্ষার মধ্যে ডুবে গেল যে আজও তা থেকে সম্পূর্ণ উঠতে পারেনি। এর প্রধান

কারণ বোধ হয় এই যে, ইংরাজ-রাজত্বের শুরুতেই বোঝা গেল, যে পুরাতন প্রথায় এদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা চলছে তাতে আর চলবে না—অথচ নতুন ব্যবস্থা যাঁরা আনতে পারতেন, সেই ইংরাজরাও সে চেষ্টা করলেন না। ম্যাক্সমুলার, কেয়ার হার্ডি, লিটনার প্রভৃতি পণ্ডিতরা পুরাতন কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছেন যে, ইংরাজ-রাজত্বের গোড়াতে শুধু বাংলা দেশেই আশী হাজার মক্তব ছিল। কিন্তু সেই সব বিদ্যালয় যখন লোপ পেল তখন ওর সিকির সিকি বিদ্যালয়ও সেখানে গ'ড়ে উঠল না।

অবশ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁরা এসেছিলেন এদেশে জমিদারী করতে, পয়সা রোজগার করতে—এদেশে শিক্ষা বিস্তার হ'লে তাঁদের অসুবিধা হবারই কথা। ইংরাজ ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বহুদিন থেকেই, প্রায় গোড়া থেকেই বারবার চেষ্টা করেছেন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করতে কিন্তু কোম্পানী প্রথমটা কিছুতেই রাজী হন্‌নি। এমন কি খ্রীশ্চান সাধুরা এদেশে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করতে যখন আসতে চেয়েছিলেন তখনও এঁরা বাধা দেন। যাই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাটা করতেই হ'ল এবং ১৮১৩ সালে এই বিপুল ভারতবর্ষের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য মাত্র এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ'ল! ক্রমে ক্রমে এই

অঙ্কটিই একটু একটু ক'রে বেড়ে চলল বটে তবে প্রয়োজনের তুলনায় সে কিছুই নয়। এদেশের লোক, যাঁরা একটু লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁরাও বিশেষ চেষ্টা করেন নি, কর্ত্তারাও না—মোট কথা, সবাইকে লেখাপড়া শেখাতেই হবে, একথা কেউ একবারও ভাবেন নি। একেবারে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের আমলে প্রথম ৭০ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হ'ল। কিন্তু তাই বা কতটুকু? ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেও, শতকরা আশীটি ছেলে শিক্ষা কেমন জিনিস তাই জানত না, মেয়েদের কথা ছেড়েই দাও।

১৯১০ সালে আমাদের গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে মশাই প্রথম রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রস্তাব আনেন, সরকারী ভাবে সবাইকেই প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হোক্। কিন্তু—শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, তাঁর সে কথা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে। তাঁর পক্ষে হ'ল মোট ১৩ জন লোক, বিপক্ষে ৩১ জন। যাই হোক্—তার পর থেকে একটু একটু ক'রে এদিকে লোকের চোখ খুলেছে বটে, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা সভা-সমিতিও ঢের হয়েছে, কিন্তু তবু আজও—আমাদের দেশে অন্তত প্রাথমিক খানিকটা লেখাপড়া যাতে সব ছেলেমেয়েই শেখে—এমন ব্যবস্থা কিছু হয়নি। এম্‌নি যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে,

তার ফলে কতকগুলো প্রাইমারী স্কুল বা প্রাথমিক পাঠশালা হয়েছে, তাতে ছেলেমেয়ে পড়ে খুব কম, আর যাও বা পড়ে তাদের মধ্যে সেই পাঠশালার তিনটে ক্লাশ পেরিয়ে শেষ অবধি যায় শতকরা সাতটারও কম।

যাক্—আজ তোমার বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশে এখন মোটামুটি যে ক'রকম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাই শুনিয়ে আজকের মত ছুটি দেব। প্রথম হচ্ছে প্রাইমারী স্কুল, লোয়ার প্রাইমারী বা আপার প্রাইমারী। এটা আগেকার পাঠশালাই, সামান্য সামান্য সব রকম শেখানোর ব্যবস্থা এতে আছে। আমাদের দেশে লেখাপড়া শেখে খুবই কম ছেলেমেয়ে, তার মধ্যে আবার অধিকাংশর দৌড়ই ঐ প্রাইমারী পর্য্যন্ত ব'লে, মোটামুটি সব রকমই কিছু কিছু ঐ চার বছরের মধ্যেই শিখিয়ে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা আছে।

এর পর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা বা সেকণ্ডারী এডুকেশনের ব্যবস্থা। এর মধ্যে হাই স্কুল ও কলেজও পড়ে। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল-লীভিং পরীক্ষার মধ্যে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সব বিষয়েই খানিকটা পড়াশোনা ক'রে নিয়ে ভাল ক'রে শেখবার জন্যে কলেজে ঢোকে; তারপর কলেজের পড়া শেষ ক'রে বিশেষ কোন একটি

বিষয়ে আরও ভাল ক'রে শেখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় পড়তে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যদিও এই সব স্কুল-কলেজের যোগ আছে, মানে কতকগুলো ক'রে ইস্কুল-কলেজ এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ মেনে নিয়েই চলে, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ অন্য রকম। লেখাপড়ার যে-কোন দিকেই তুমি ভাল ক'রে শিখে ওস্তাদ হতে চাও না কেন, ওখানে তার ব্যবস্থা আছে। সেই জন্যেই বোধ হয় এর নাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের দেশে আগে বিক্রমশীলা, ওদণ্ডপুরী, তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, দেশ বিদেশ থেকে সেখানে হাজার হাজার ছাত্র আসত শিখতে। তারপর এ জিনিসটি একরকম চ'লেই যায় আমাদের দেশ থেকে—বহু বৎসর পরে ইংরেজদের আমলে একেবারে নতুন ভাবে আবার দেখা দিলে। ১৮৫৭ সালে কলকাতায় প্রথম ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ ও বোম্বেতে এবং কয়েক বৎসর পরে পাঞ্জাবে ও এলাহাবাদে (১৮৮২, ১৮৮৭) আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হ'ল। এই পাঁচটিতেই বহুদিন কাজ চলবার পর একেবারে ১৯১৬ সালে কাশীতে ও মহীশূরে আর দুটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপিত হ'ল। তারপর দেখা দিল আরও অনেকগুলি, ১৯১৭—পাটনা, ১৯১৮—ওসমানিয়া, ১৯২০—আলিগড় ও লক্ষ্ণৌ, ১৯২১—ঢাকা, ১৯২২—দিল্লী, ১৯২৩—নাগপুর, ১৯২৬—অন্ধ্র, ১৯২৭—আগ্রা, ১৯২৯—আন্নামালাই, ১৯৩৭—ত্রিবাঙ্কুর আর একেবারে সম্প্রতি কটকে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধারণ কলেজে বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা আছে। বি-এ যাঁরা পাস করেন তাঁদের বলে গ্রাজুয়েট। এর পর পড়ার ব্যবস্থা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে—সেই জন্যই তাকে বলে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ, মানে গ্র্যাজুয়েট হবার পরে যেখানে পড়তে হয়—সেই বিভাগ। গ্র্যাজুয়েটের সুন্দর একটি সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে—স্নাতক, সেই হিসেবে এ'কে স্নাতকোত্তর বিভাগ বলা যেতে পারে। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন থেকে শুরু ক'রে বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়েই পড়াবার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের দেশে এখন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলি হয়েছে বটে তবু লোকসংখ্যার অনুপাতে সে বিশেষ কিছু নয়। সেই জন্য আরও একরকম শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে—বয়স্ক লোকদের জন্য। ছেলেবেলায় যারা হয়ত লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি কিংবা তার দাম

বুঝতে পারেনি, তোমাদের বন্ধু হেবোর মত ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছে—তারা অনেক সময় বড় হ'য়ে একটু লেখাপড়া শিখতে চায়। বিশেষত চাষা-ভুষোরা আমাদের দেশে একেবারে কিছুই জানে না; তারা যদি একটুখানিও লেখাপড়া করে তা'হলেও তার দাম বুঝতে পারবে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের অন্তত শেখাবার জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু এদের পক্ষে ইস্কুলে বা পাঠশালায় শিখতে যাওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার।

শুধু আমাদের দেশে নয়। সব দেশেই এ অসুবিধা অল্প-বিস্তর ভোগ করতে হয়েছে। বিলেতে প্রায় দেড়শ' বছর আগে এবং আমেরিকাতে একশ' বছর আগেই এ ব্যবস্থার দিকে সকলে মন দিয়েছে। তারপর ডেনমার্ক সুইৎসারল্যাণ্ড, চীন, তুর্কী, ইরান—বহুদেশই এদিকে মন দিয়ে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়েছে। রাশিয়া এক সময়ে আমাদের দেশের মতই লেখাপড়ায় পেছনে প'ড়ে ছিল। ওরা সম্প্রতি এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে খুব এগিয়ে গেছে। এজন্যে দুটি ব্যবস্থার দিকে খুব জোর দিয়েছে। অসংখ্য জাদুঘর বা ম্যুজিয়াম গড়ে তুলেছে ওরা দেশের সর্ব্বত্র। এই পড়ার সময় বা সুযোগ যাদের নেই তারা এই সব দেখে'ও অনেকটা

শিখতে পারবে। আর একটা জিনিস করেছে—দলবেঁধে বেড়াতে যাওয়া। দেশভ্রমণ শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বুঝতে পেরে ওরা নিয়ম করেছে যে, সামান্য কিছু চাঁদা নিয়ে ওরা এক-একটা দল গড়বে, তারপর সবাই মিলে বেড়িয়ে আসবে—যখন যতদূর যাওয়া সম্ভব হয়। শিক্ষার এ দুটো ব্যবস্থাই যে খুব দামী তা কখনও ভুলো না।

আমাদের দেশে এখনও শতকরা বারোটা লোকের মাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে—অথচ এখনও এরকমভাবে বড়দের লেখাপড়া শেখানোর পুরোপুরি একটা কিছু ব্যবস্থা হয়নি। যেটুকু চেষ্টা হয়েছে—একেবারেই এই সেদিন থেকে। বোধ হয় চার পাঁচ বছর মাত্র শুরু হয়েছে।

এ ছাড়াও, আমাদের দেশে যে-শিক্ষার অভাব আছে সে হচ্ছে শিল্প-বিদ্যালয়ের। ধরো সকলের মাথা সমান সাফ্ নয়, সবাই বি-এ এম-এ পাস করতেও পারে না, তাছাড়া সকলেই যদি বি-এ, এম-এ পাস করে ত খাবে কি? কিন্তু এমনি লেখাপড়ায় যাদের মন নেই তারা হয়ত হাতে-কলমে কাজ শিখতে চায়। কারুর হয়ত যন্ত্রপাতি কলকব্জার কাজ শেখার ইচ্ছে, কেউ হয়ত কাঠের কাজ কিংবা কাপড় রং করার কাজ শিখতে চায়; কেউ বা ছবি আঁকাতে কিংবা বিদ্যুতের ব্যাপারে আনন্দ

পায় বেশি। এদের জন্য যে সব শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা আছে তাকেই আমরা মোটামুটি শিল্পবিদ্যালয় নাম দিয়েছি। আগে গুরু-পরম্পরায় এসব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই ধরণের বিদ্যালয় ইংরেজী আমলে প্রথম দেখা দেয় ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮র মধ্যে। ঐ সময় কলকাতা, মাদ্রাজ, পুনা ও রুরকীতে প্রথম চারটি ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ বা যন্ত্রবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর থেকে অবশ্য এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি ইস্কুল হয়েছে—কিন্তু তবু আরও হওয়া দরকার।

অন্য সমস্ত দেশের চেয়ে চীন কিন্তু এই বিশেষ শিক্ষাটিতে সকলের চেয়ে এগিয়ে গেছে। চীন যে বিজ্ঞানের ব্যাপারে বরাবরই অগ্রণী তা তোমাকে অনেক বারই বলেছি। যন্ত্রপাতিটা ওরা বোঝে ভাল। ধরো, খনি থেকে কয়লা তোলা, কাগজ তৈরী, বারুদ তৈরী, কম্পাস বা দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্র সবই ওরা প্রথম মাথা খাটিয়ে বার করে। যন্ত্রবিজ্ঞানের সমস্ত দিকেই ওরা উন্নতি, করেছে বহুদিন থেকে। কয়েক হাজার বছর আগে খ্রীষ্ট জন্মাবারও দু'হাজার বছর আগে, ওদের এক সম্রাট য়ু বিরাট এক বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকে সমস্ত দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। তিনি নাকি আগে সম্রাট

ছিলেন না, ঐ বাঁধ দেবার ফলেই প্রজারা খুশী হয়ে সবাই মিলে তাঁকে সম্রাট করে। তাঁরই জন্মদিন ব'লে ৬ই জুন তারিখটিতে চীন দেশের সমস্ত যান্ত্রিকরা উৎসব করে— যেমন আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মার পূজা হয়।

এছাড়া স্থাপত্য বা বাড়ী-ঘর-মন্দির তৈরী—পূর্ত্ত বা খালকাটা, জলসেচন করার কৌশলও ওরা অনেকদিন ধ'রেই জানে। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের কথা কে না শুনেছে, সে ত হ'লও বড় কম দিন নয়। কোয়ানসীনের বিরাট খাল—যা চাষের সুবিধার জন্যে সেই দু' হাজার বছর আগে কাটানো হয়েছিল—তা দেখে আজও অনেক বড় বড় যন্ত্রবিদ্ অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

এছাড়া রুপোর কাজ, চীনেমাটির বাসন তৈরীর জন্যে ত ওরা চিরদিনই লোকের সুখ্যাতি পেয়ে এসেছে। এসব কিন্তু ওরাও আমাদের দেশের মত গুরুপরম্পরায় শিখে এসেছে। ওস্তাদ কারিগরের কাছে সাগ্‌রেদ্‌রা যেত শিখতে, তিনি শেখাতেন বিদ্যে, এরা তাঁর কাছে খেটে, সেবা ক'রে এবং কারখানার কাজে সাহায্য ক'রে তাঁর ঋণ শোধ দিত। এই ভাবেই চলে এসেছে হাজারের পর হাজার বছর। কিন্তু নিয়মমত ইস্কুল-কলেজ ক'রে এসব শেখানো শুরু হয়েছে বলতে গেলে এই সেদিন— ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে—সম্রাট টুং চি-র আমলে। তারপরে

১৮৯৬তে রেশমের চাষ শেখানোর জন্যে প্রথম ইস্কুল খোলা হয়। এ বিদ্যাটিও এরা বহুদিন জানত, আমাদের মহাভারতে পর্য্যন্ত চীনা রেশমের উল্লেখ আছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে এরা যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির আইন করে তাতে ব্যবস্থা করা হয় যে ছয় বৎসর প্রাইমারী বা প্রাথমিক শিক্ষালয়ে সকলকে পড়তে হবে, তারপরই ইচ্ছা করলে শিল্প বা যন্ত্র-বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে। আমাদের মত ইস্কুলও আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুলও আছে—যার যেটায় ইচ্ছা পড়তে পারো। দুটোই ছ'বছর ক'রে—তারপর চার বছর কলেজ। কলেজও ঐ দু'রকম।

কিন্তু এই ব্যাপারে ওরা সব চেয়ে এগিয়ে গেছে গত কয়েক বছরে—যুদ্ধ বাধবার পরে। কত যে এগিয়ে গেছে তা দুটি নমুনা থেকেই বুঝতে পারবে—১৯৩৭ সালে ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজে মোট ছাত্র ছিল ৫৭৬৮ জন, কৃষি ও অরণ্য-বিষয়ক বিদ্যালয়ে ছিল ১৮০২ জন। সে জায়গায় ১৯৪১ সালে দাঁড়িয়েছিল প্রথমটিতে ১১,২২৬ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ৩৬৭৫ জন।

এই সব কথা বলতে বলতে, ওরা ১৯৩৮ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে শিক্ষাবিভাগ থেকে জনশিক্ষার যে আদর্শ প্রচার করেছিল সেই কথা মনে প'ড়ে গেল। (১) তার প্রথম আদর্শ হ'ল জাতির জন্য স্বার্থত্যাগ—সকলকেই এই

মন্ত্র শিখতে হবে ছেলেবেলা থেকে। (২) দ্বিতীয়ত হ'ল শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারে আবিষ্কারের আগ্রহ বৃদ্ধি। (৩) রাষ্ট্রই সকলের ওপরে, প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে। (৪) এই কয়টি হবে সমস্ত শিক্ষার মূলমন্ত্র—মুক্তি, স্বাধীনতা ও সাম্য। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে যে সব পাঠ্যতালিকা তৈরী হবে তার মধ্যে লক্ষ্য রাখা হবে এই কয়টি ব্যাপারে—আস্থা, দেশের নেতাদের উপর ; চরিত্রগঠন, বারোটি নিয়ম পালন করতে হবে ; স্বাস্থ্য,—শিক্ষায় ও ব্যায়ামে ; পরিচ্ছন্নতা আর সেবা। ধর্ম্মও সেখানে শিক্ষার ব্যাপার ব'লে গণ্য হয়।

কী চমৎকার এদের আদর্শ বলো দেখি! আর কত সহজ।

মোটামুটি তোমাকে আজ লেখাপড়ার ব্যাপার অনেক কিছু শুনিয়ে দিলুম। বেলাও হয়েছে ঢের, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে বেশ বুঝতে পারছি—এইবার মনে মনে চ'টে উঠছ! যাক্—আজ এই পর্য্যন্তই হয়ে রইল, আর একদিন যদি সময় পাওয়া যায়, আর তোমারও শোনবার ইচ্ছে থাকে ত আর কিছু বল্‌ব। আজ তাহ'লে আসি।

শেষ